POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 29

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 20 জুলাই, 2023 30 যুল হাজ্জা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হুকুকুল ইবাদ

২৩৯৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট দিয়ে যখন কোন এমন ব্যক্তির জানাযা আসত যার উপর ঋণ থাকত, তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করতেন, সে কি নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য কোন সম্পদ রেখে গেছে?' লোকেরা যদি বলত , 'হ্যাঁ', তবে তিনি জানাযা পড়াতেন, অন্যথায় মুসলমানদের বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। আল্লাহ্ তা'লা যখন বিজয় দান করলেন তখন তিনি (সা.) বললেন, 'আমি মুসলমানদের তাদের (আত্মীয়দের) থেকেও বেশি কাছের। তাই মোমেনদের মধ্য থেকে যে মৃত্যু বরণ করে আর ঋণ রেখে যায় তার ঋণ পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব আর যে কেউ সম্পদ রেখে যায় সেগুলো তার ওয়ারিসদের।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) এর হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন- ফিকাহবিদগণ এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নও তুলেছেন যে, ঋণগ্রস্তদের জানাযার নামায না পড়া এক প্রকার সতর্কতা না নিষেধাজ্ঞা? কিন্তু যাতে মানুষের হুকুকুল ইবাদ প্রদানের বিষয়ে চিন্তা থাকে এবং এটিকে সাধারণ বিষয় মনে না করে। কিন্তু যদি ঋণগ্রস্তের জানাযার নামা পড়া নিষিদ্ধ হত তবে সাহাবাদের নামায পড়তে বলতেন না। এর থেকে জানা যায় যে, এটা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় নয় বরং সতকর্তার জন্য ছিল।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৬ মে ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

নবী তাদেরকে বলা হয় যাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক এমন চরম সীমায় উপনীত হয় যে, তারা খোদার সঙ্গে কথোপকথন করেন এবং ঐশী বাণী লাভ করেন। শহীদ হল এমন শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী যে খোদা তা'লার পথে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সালেহীন তাদেরকে বলা হয় যাদের মধ্য থেকে যাবতীয় বিশৃঙ্খলার বীজ দূর হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- এ 'আন আমতা আলাইহিম' এর পথ অন্বেষণ করা হয়েছে। আমি একাধিক বার একথা বর্ণনা করেছি যে, 'আন আমতা আলাইহিম' এর মধ্যে চারটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। অতএব, একজন মোমেন যখন এই দোয়া যাচনা করে তখন তাদের মত স্বভাব, চরিত্র এবং জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে যদি সে এই চার শ্রেণীর চরিত্র অর্জন না করতে পারে তবে এই দোয়া তার জন্য নিষ্ফল হবে আর সে হল নিষ্প্রাণ বাক্য উচ্চারণকারী এক পশু। এই চার শ্রেণীর মানুষ তারা, যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে উন্নত জ্ঞান ও উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে। নবী তাদেরকে বলা হয় যাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক এমন চরম সীমায় উপনীত হয় যে, তারা খোদার সঙ্গে কথোপকথন করেন এবং ঐশী বাণী লাভ করেন। সিদ্দীক তাদেরকে বলো হয় যারা 'সিদক' বা সত্যকে ভালবাসে। সব থেকে বড় সিদক বা সত্য হল- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه । এবং দ্বিতীয় সত্যটি হল 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্। তারা সত্যের সকল পথকে ভালবাসে এবং সত্যকেই চায়। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষরা শহীদ নামে অভিহিত। তারা যেন খোদা তা'লার সাক্ষাত দর্শন করেন। যারা নিহত হয়- যেমন, কোন যুদ্ধে বা মহামারিতে, কেবল তারাই শহীদ নয়। বরং শহীদ হল এমন শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী যে খোদা তা'লার পথে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সালেহীন তাদেরকে বলা হয় যাদের মধ্য থেকে যাবতীয় বিশৃঙ্খলার বীজ দূর হয়েছে। যেমন মানুষ যখন সুস্থ-সবল থাকে তখন তার মুখের স্বাদও ঠিক থাকে। মানবদেহের সমস্ত কিছুর সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাকে সুস্থ্যদেহ বলা হয়, তার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে না। অনুরূপভাবে সালেহীনদের মাঝেও কোনও প্রকারের আধ্যাত্মিক ব্যাধি এবং গোলযোগপূর্ণ কিছু থাকে না। এই অবস্থার চরম পর্যায়টি অর্জিত তার অস্বীকৃতির মাধ্যমে। অপরদিকে শহীদ, সিদ্দীক এবং নবীর চরম ঔৎকর্ষ ঘটে বাস্তবিক কর্ম সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে। শহীদের ঈমান এতটা শক্তিশালী হয় যে সে যেন খোদাকে দর্শন করে। সিদ্দীক বাস্তবিকভাবে সত্যকে ভালবাসে এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকে।আর নবীর উৎকর্ষ ঐশী আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। অনেকে বলে, এই ঔৎকর্ষ অন্য কেউ লাভ করতে পারে না আর মৌলবী বা উলেমারা বলে, বাহ্যিকভাবে কলেমা পাঠ করা এবং নামায রোযা ইত্যাদি আদেশ মেনে চলা উচিত, এর থেকে বেশি কোন ফল বা পরিণাম নেই আর কোন তাৎপর্যও নেই। এটা অনেক বড় ভুল এবং ঈমানী দুর্বলতা। তারা নবুয়তের উদ্দেশ্য বুঝতেই ব্যর্থ হয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৫, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন তুমি বলে দাও আমি তোমার নিকটে আছি। আর নৈকট্যের লক্ষণ হল আমি প্রার্থনকারীর আহ্বানে সাড়া দিই।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا
يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا

সূরা বনী ইসরাইলের ৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

শিরকের বিষয়টি পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এতে একটি নতুন দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে, অকারণই এখানে পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। বলা হয়েছে যে, শিরক যদি সঠিক হত তবে মুশরিকরা কি খোদার নৈকট্য লাভকারী হত না? اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا এর অর্থ এটাই যে, যদি শিরক সঠিক হত তবে মুশরিকরা আরশের অধিপতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক তৈরী করে ফেলত। কেননা, তাদের পুত্র বা কন্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে তাদের জন্য নৈকট্যের পথ উন্মুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

অপর এক স্থানে কুরআন করীমে মুশরিকরা নিজেরাই দাবী করছে-তারাও এই উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের জন্য তাদের উপাসনা করত। যেমনটি সূরা যুমর এ আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

(যুমর,রুকু-১) আমরা এই প্রতিমাগুলির ইবাদত এজন্য করছি, এরা যেন আমাদেরকে খোদার নৈকট্য এনে দেয়। এখানে তাদের নিজেদের দাবীকে তাদের শিরকের প্রত্যাখ্যানে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে যে, যখন আরশের অধিপতির নৈকট্য লাভই তাদের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঙ্গে তাারা সম্পর্কও তৈরী করে ফেলেছে তবে তো তাদের খোদার নৈকট্যভাজন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে এর কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কুরআন শরীফ থেকে জানা যায় যে খোদার নৈকট্যলাভের লক্ষণ নিম্নরূপ-

প্রথমত, দোয়া কবুল হওয়া। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ
قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন তুমি বলে দাও আমি তোমার নিকটে আছি। আর নৈকট্যের লক্ষণ হল আমি প্রার্থনকারীর আহ্বানে সাড়া দিই। এটি এমন এক লক্ষণ যার সঠিক হওয়ার বিষয়ে মুশরিকরাও অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই লক্ষণ কোন মুশরিকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এমন কোন মুশরিক নেই যে তার দোয়া কবুল হওয়ার দাবি করতে পারে।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এর জন্য আপনার উপর প্রতিবার ইলহাম হবে বা কোন সত্য স্বপ্ন দেখবে বা এই ধরণের কোন ঘটবে এমনটা জরুরী নয়। নামাযের পর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাওয়ার পর মন যদি আশ্বস্ত হয়, প্রশান্তি লাভ করে, তবে এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল।

সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা, তাঁর সামনে বিনত হওয়া এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এটিই একজন মোমেনের লক্ষণ। ক্রমশ আপনি উন্নতির পথে পরিচালিত হবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করবেন।

সব সময় একথা মাথায় রাখবেন যে, আপনি যা কিছু করছেন তা আল্লাহ্ তা'লা সর্বক্ষণ দেখছেন এবং তিনি আপনার তত্ত্বাবধান করছেন। মানুষ না দেখলেও আল্লাহ্ তা'লা দেখছেন। আপনি যেহেতু জামাতের কারণে এখানে এসেছেন, যেহেতু আপনার পিতা বা কোন আত্মীয় জামাতের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাই আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর প্রতি মনোযোগী হওয়ার, সেগুলো মেনে চলার, নিজেকে আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত এবং একজন আহমদী মোমেন হিসেবে তুলে ধরার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ১৬ ই অক্টোবর তারিখে কানাডার মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সাথে অনলাইন সাক্ষাত

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে কানাডা জামাতের ওয়াকফীনে নও মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া -র সাথে অনলাইন সাক্ষাত করেন। ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড) এম.টি.এ স্টুডিও থেকে তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ৫০০জন খুদ্দাম মিসিসাগার অন্টোরিয়া স্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার থেকে অন-লাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর খুদ্দামরা হুযুরকে নিজেদের প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি চিঠিতেও এই সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন। আপনি নিয়মিত আমাকে চিঠি লেখেন আর আপনার প্রত্যেকটি চিঠিতে একটি করে প্রশ্ন থাকে। আর আমি আপনার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি। আপনিই কি সেই সব চিঠিগুলি লেখেন?

খাদিমটি উত্তর দেয়- জ্বী হুযুর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ভাল কথা, আমি খুশি যে, আপনি এই সব আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে, ধর্মীয় মতবাদ এবং ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোযোগী। দেখুন, একথা ঠিক যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এর জন্য আপনার উপর প্রতিবার ইলহাম হবে বা কোন সত্য স্বপ্ন দেখবে বা এই ধরণের কোন ঘটবে এমনটা জরুরী নয়। নামাযের পর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাওয়ার পর মন যদি আশ্বস্ত হয়, প্রশান্তি লাভ করে, তবে এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল। আপনি যতটা চান এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এটি এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, কোন জিনিসকে আপনি স্বল্পকালের জন্য অর্জন করতে পারেন না। আপনি যখন একজন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র, তখন এমন কোন ব্যক্তির মোকাবেলা করতে পারবেন না যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তবুও আপনাকে সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অনেক পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে কাজ করতে হবে। এমনটি করতে থাকলে একদিন ইনশাআল্লাহ্ আপনি ভাল ফল পাবেন। সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা, তাঁর সামনে বিনত হওয়া এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এটিই একজন মোমেনের লক্ষণ। ক্রমশ আপনি উন্নতির পথে পরিচালিত হবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করবেন।

প্রশ্ন: বর্তমান যুগে আধুনিক মেডিসিন হোমিওপ্যাথিককে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। ওয়াকফে নও হিসেবে আমরা পৃথিবীকে হোমিওপ্যাথির বাস্তবতা তুলে ধরতে পারি এবং মানব দেহে এর ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে কিভাবে সচেতন করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, হোমিওপ্যাথিক এক ধরণের ঔষধ, এক ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি যা মানুষের চিকিৎসার কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথিকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে ভেবে আপনার চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হল আমরা কিভাবে মানুষের উন্নত চিকিৎসা করতে পারি। তাই হোমিওপ্যাথি বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখা। এর উপর বিশ্বাস রাখতে পারলে ভাল। যারা হোমিওপ্যাথির উপর বিশ্বাস রাখে না তাদের উপর এই ওষুধ প্রয়োগ করলে কাজ করবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতি এক ব্যক্তির দৃঢ় ঈমান ছিল। সেই কারণে তার বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছেলেদেরও আল্লাহ তা'লার সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক আছে। একবার তার প্রচণ্ড পেট ব্যাথা হয়, কোন ওষুধ কাজ করছিল না। সেই সময় হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, যিনি তাকে চিনতেন, তাকে দেখার জন্য যান। তিনি ব্যাথায় কাতরাচ্ছিলেন। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিন চার মিনিট পর তাকে বললেন, মুখ খুলুন। এরপর তিনি বড়ি জাতীয় কিছু তার মুখে ফেলে বললেন, পানির সাথে গিলে নিন। দশ মিনিট পর রুগি সুস্থ হয়ে উঠল। কেউ একজন হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, রুগির অনেক কষ্ট হচ্ছিল। আমি জানতাম মনস্তাত্ত্বিকভাবে এর চিকিৎসা সম্ভব। তাই আমি আমার পকেটে থাকা একটুকরো কাগজকে দোয়া করে বড়ির মত করে তাকে খাইয়ে দিয়েছি আর এতেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই এই ধরণের চমৎকার হয়ে থাকে। কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে যেগুলি এমনভাবে কাজ করে যেন কোন অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটল। কিন্তু হোমিওপ্যাথি প্রত্যেক রুগী এবং প্রত্যেক রোগের চিকিৎসায় অবশ্যই কাজ করবে এমনটি জরুরী নয়। হোমিওপ্যাথিকে গবেষণা হচ্ছে না এমনটা সঠিক নয়। ফ্রান্স ও জার্মানীতে অনেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক গবেষণার কাজে নিয়োজিত আছেন, যাঁরা কিছু কিছু নতুন ওষুধও তৈরী করেছেন যেগুলি বহু রোগের চিকিৎসার জন্য উপযোগী হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। আপনার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই, এটা শরিয়ত সংক্রান্ত কোন বিষয় নয়। আপনি হোমিওপ্যাথির উপর বিশ্বাস রাখলে সেটা ভাল কথা। কিন্তু হোমিওপ্যাথির উপর যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের উপর জোর করে নিজের এমন চিন্তাধারা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না যে তারা যেন অবশ্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করায়।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান ও ইয়াকীন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথম কথা এই যে, আপনি ফজরের নামাযে কতটা সময় ব্যয় করেন? পাঁচ মিনিট?

খাদিম উত্তর দেয়, পাঁচ থেকে দশ মিনিট।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে সূরা ফাতিহা কিভাবে বোঝা সম্ভব? সুন্নত হোক বা নফল এই একক নামাযগুলিতে আপনি বার বার সূরা ফাতিহা পাঠ করুন আর বার বার 'ইহদিনাস সিরাতুল মুসতামি' পাঠ করুন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। এর জন্য বার বার নামাযে সূরা ফাতিহার পুনরাবৃত্তি করুন। আর সেজদায় বার বার এই দোয়া করুন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাকে একজন উন্নত মোমেন হওয়ার সামর্থ্য দেন এবং ঈমানে দৃঢ়তা দান করেন। এতে আপনার সময় লাগবে। আপনি এখন কি করছেন? স্কুলে না কলেজ যাচ্ছেন?

খাদিম উত্তর দেয়, দ্বাদশ শ্রেণীতে সে পাঠরত। হুযর আনোয়ার বলেন, মাধ্যমিক স্তরে এটা আপনার শেষ বছর। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে কাজ করেন আর আপনাকে যে বিষয়গুলি পড়ানো হচ্ছে, যা কিছু আপনার পাঠ্যক্রমের মধ্যে আছে, সেগুলি যদি গভীরভাবে অধ্যায়ন না করেন তবে আপনি এগোতে পারবেন না বা জীবনে সফল হতে পারবেন না। তাই আপনি তাকওয়ার মানোন্নয়নে পরিশ্রম ও একাগ্রতা ছাড়া কিভাবে উন্নতি করতে পারেন? বর্তমানে আপনি স্কুলের পর ছয়-সাত ঘন্টা পড়াশোনায় ব্যয় করছেন, বিশেষ করে পরীক্ষার দিনগুলিতে। কিন্তু এখানে আপনি দিচ্ছেন মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিট। আর আপনি যে কুরআন করীমের তেলাওয়াত করেন সেখানেও জানেন না যে কি পাঠ করছেন! তাই কোন বিষয় আপনার জানা না থাকলে আপনি কিভাবে উত্তর লিখবেন? না বুঝে কোন বিষয় পড়লে পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র দেখে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। প্রশ্ন বুঝতে পারার জন্য আপনাকে বইয়ের বিষয়ে এবং শিক্ষক সেটা কিভাবে পড়িয়েছিলেন তা অবশ্যই জানা থাকা জরুরী। তবেই আপনি প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবেন। এখানে আল্লাহ্ তা'লা কি বলছেন তা আপনার জানা নেই, এদিকে আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন যে আল্লাহ্ তা'লার উপর কিভাবে ঈমান আনতে পারি? আপনি যখন এটাই জানেন না যে আল্লাহ্ তা'লা কি বলছেন তবে তাঁর উপর ঈমান আনা কতটা যুক্তিসঙ্গত? তাই আপনাকে এর সঙ্গত কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং কুরআন করীমের অনুবাদ পড়তে হবে। এরপর আপনি জানতে পারবেন। এই জিনিসগুলিই আপনাকে ঈমান ও ইয়াকীনে উন্নতি দান করবে।

প্রশ্ন: একজন আহমদী যখন অনেক পাপাচারে লিপ্ত হতে থাকে, জামাত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং নিজের জন্য ক্ষতি ডেকে আনে, তখন তাকে কিভাবে বোঝানে যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আসল কথা হল আপনাকে সর্বপ্রথম এর কারণ জানতে হবে। সে যদি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় তবে আপনার জানা থাকা উচিত যে এখন তার কাছে কোন কোন বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পায়? কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে? কাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব? সে কি আপনার থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর খারাপ এবং অপকর্মে লিপ্ত থাকা ছেলেদের সঙ্গে

এটিকে [আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সত্তা] কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন। একে বাদ দিয়ে আমাদের ধর্ম, আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না আর আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শরীয়তের ওপর আমল করাও সম্ভব নয়।

আঁ হযরত (সা.)–এর পবিত্র জীবনের প্রেক্ষাপটে বদরের যুদ্ধের পটভূমির বর্ণনা।

মৃত্যু সংবাদ ও জানাযা

মাননীয় খাজা মুনীরুদ্দীন ক্বমর সাহেব (যুক্তরাজ্য) জানাযা হাজির, মাননীয় সাহেবযাদা ডক্টর মির্যা মুবাশ্বির আহমদ ওয়াকফে জিন্দগী (রাবোয়া), মাননীয়া সৈয়্যদাহ আমাতুল বাসিত সাহেবা (ইসলামাবাদ) এবং মাননীয় শরীফ আহমদ সাহেব বান্দেশা (ফয়সলাবাদ)।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২ জুন ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (২ এহসান ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বদরী সাহাবীদের জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক, তাঁদের পরিচয় এবং তাঁদের বিভিন্ন কুরবানী সম্পর্কে আমি খুতবায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণ না করেছি। অনেকেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে লিখেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত যদি বর্ণনা করা না হয় তাহলে বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, কেননা মূল কেন্দ্রবিন্দু তো ছিল তাঁর সত্তা; যাঁর চতুষ্পার্শ্বে সাহাবীরা প্রদক্ষিণ করতেন, যাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সাহাবীরা ত্যাগের সুমহান মান অর্জন করেছেন, আর নিত্য নতুন রীতি-পদ্ধতি শিখেছেন, তৌহীদের প্রচার-প্রসার এবং স্বয়ং এর বাস্তব উদাহরণ হওয়ার সেই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি ও আল্লাহ্ তা'লার একান্ত প্রিয়ভাজন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কাজেই, তাঁর (সা.) জীবনী বর্ণনা করাও আবশ্যক।

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে খুতবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু তাঁর (সা.) জীবনচরিত এমন যে, এর আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। (তাঁর) এক একটি বৈশিষ্ট্য এমন যে, তা কয়েক খুতবায়ও আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আর এই জীবনচরিত বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা হতেও থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। বরং প্রতিটি খুতবা এবং বক্তৃতায় কোনো না কোনো দিক, কোনো না কোনো আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েও থাকে, কেননা এটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন। একে বাদ দিয়ে আমাদের ধর্ম, আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না আর আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শরীয়তের ওপর আমল করাও সম্ভব নয়।

যাইহোক, এখন আমি বদরের যুদ্ধের বরাতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনা করব আর এই ধারা আগামী কয়েকটি খুতবায়ও অব্যাহত থাকবে।

তাঁর (সা.)-এর আদর্শই সাহাবীদেরকে নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রেরণা জুগিয়েছে। আর এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা গাজী, শহীদ, আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার দৃষ্টান্ত আমরা তাদের জীবনে দেখেছি। অতএব এই যুদ্ধের বরাতেও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ বর্ণনা করা আবশ্যক।

যুদ্ধের ঘটনাবলীর পূর্বে সেসব কারণ বর্ণনা করাও আবশ্যক যে কারণে যুদ্ধ হয়েছিল। এ কারণে আমি প্রথমে কিছুটা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করব। এই পটভূমিতে মহানবী (সা.)-এর জীবনী এবং তাঁর আনীত অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূটিত হয়।

বদরের যুদ্ধের কারণগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কী জীবনে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর যেসব যুলুম-নির্যাতন করেছে আর ইসলামকে নির্মূল করার জন্য যেসব ষড়যন্ত্র তারা করেছে তা সকল যুগে, যে-কোনো অবস্থায় যে কোন দু'টি জাতির মাঝে যুদ্ধ বাঁধার কারণ হিসাবে যথেষ্ট। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, চরম অসম্মানজনক ঠাট্টাবিদ্রূপ এবং অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক তীর্যক তিরস্কার ও ভর্ৎসনা ছাড়াও মক্কার কাফিররা মুসলমানদেরকে এক খোদার ইবাদত ও একত্ববাদের ঘোষণা হতে বাহুবলে বাধা প্রদান করেছে। তাদেরকে চরম নির্দয়ভাবে মারধর করেছে। অন্যায়ভাবে তাদের ধনসম্পদ গ্রাস করেছে। তাদেরকে বয়কট করে ধ্বংস ও বিনাশ করার চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে কতককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের মহিলাদের অসম্মান করেছে, এমনকি এসব যুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে কিন্তু কুরাইশরা তারপরও ক্ষান্ত হয় নি বরং নাজ্জাশীর দরবারে নিজেদের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে চেষ্টা করে– যেন কোনোক্রমে এই মুহাজিররা মক্কায় ফিরে আসে আর কুরাইশরা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে সফল হয় অথবা যেন তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। এরপর মুসলমানদের মনিব ও নেতাকে চরম কষ্ট এবং সকল প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে, যাঁকে তারা প্রাণাধিক ভালো বাসতেন। তায়েফে কুরাইশদের সাঙ্গপাঙ্গরা খোদা তা'লার নাম নেওয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি পাথর বর্ষণ করে, এমনকি তাঁর (পুরো) দেহ রক্তেরঞ্জিত হয়ে যায়। অবশেষে মক্কার জাতীয় সংসদে কুরাইশদের সকল গোত্রের প্রতিনিধিবর্গের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যাতে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে যায় আর চিরতরে তৌহীদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এই হিংস্র রেজুলেশনকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত মক্কার যুবকরা রাতের বেলা দলবদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে হামলে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করেন আর তিনি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সওর গুহায় আশ্রয় নেন। এসব অত্যাচার-নিপীড়ন ও রক্তপিপাসু রেজুলেশন কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর নয় কী? এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো বিবেকবান ধারণা করতে পারে কি যে, মক্কার কুরাইশরা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল না? এছাড়া কুরাইশদের এসব যু লুম-অত্যাচার কি মুসলমানদের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল না? পৃথিবীর কোনো আত্মভিমানী জাতি যারা আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় নি, এহেন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কুরাইশরা মুসলমানদেরকে যে ধরনের আল্টিমেটাম দিয়ে রেখেছিল তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে কী? মুসলমানদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতি হলে নিঃসন্দেহে তারা এর অনেক আগেই কুরাইশের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হতো কিন্তু মুসলমানদেরকে তাদের মনিবের পক্ষ থেকে ধৈর্য এবং মার্জনার নির্দেশ ছিল। যেমন তিনি (রা.) লিখেছেন, মক্কার কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতন যখন অনেক বেড়ে যায় তখন আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে কুরাইশের মোকাবিলা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, ইন্নি উমিরতু বিল আফয়ী ফালা তুক্বাতিলু অর্থাৎ আমার প্রতি এখনও ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে তাই আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিতে পারি না। অতএব সাহাবীরা ধর্মে র খাতিরে সকল প্র কার দুঃখ-কষ্ট এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছেন কিন্তু ধৈর্যহারা হন নি। এমনকি কুরাইশের অত্যাচার-নির্যাতনেরমাত্রা যখন ছাড়িয়ে যেতে থাকে এবং বিশ্ব প্রতিপালকের দৃষ্টিতে তারা শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা তাঁর বান্দাকে আদেশ দেন যে, তুমি এই জনপদ ছেড়ে চলে যাও, কেননা বিষয়টি এখন ক্ষমার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে আর অত্যাচারীর নিজ অপকর্মের পরিণাম ভোগ করার সময় এসে গেছে। অতএব মহানবী (সা.)-এর এই হিজরত কুরাইশের আল্টিমেটাম গ্রহণ করার লক্ষণ ছিল আর এতে খোদার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, যা মুসলমান এবং কাফির উভয় (পক্ষই) বুঝতো। যেমন দ্বারুন্ নদওয়াতে (এটি কাবাগৃহের নিকটে কুরাইশদের শলা-পরামর্শের জায়গা ছিল) পরামর্শকালে জনৈক ব্যক্তি যখন এই প্রস্তাব দেয় যে, মহানবী (সা.)-কে মক্কা থেকে বহিস্কার করা হোক। তখন কুরাইশ নেতারা এই প্রস্তাবটি এজন্য নাকচ করে দেয় যে, যদি মুহাম্মদ (সা.) মক্কা ত্যাগ করেন তাহলে মুসলমানরা অবশ্যই আমাদের আল্টিমেটাম গ্রহণ করে আমাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবে। আর মদীনার আনসারের সামনেও যখন আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.)-এর হিজরতের প্রশ্ন আসে তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ বলে, এর অর্থ হলো আমাদেরকে গোটা আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আর মহানবী (সা.) স্বয়ং যখন মক্কা থেকে বের হন আর তিনি (সা.) মক্কার বসতির প্রতি আক্ষেপের সাথে দৃষ্টিপাত করে বলেন, হে মক্কা! তুই আমার কাছে সকল জনপদের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলি, কিন্তু তোর বাসিন্দারা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না। তখন হযরত আবু

বকর সিদ্দীক (রা.)ও একথাই বলেন, তারা আল্লাহ্‌র রসূলকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে; এখন এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে।

সারকথা হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত মহানবী (সা.) মক্কায় অবস্থান করেছেন তিনি (সা.) সর্ব প্রকার অত্যাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু কুরাইশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি, কেননা প্রথমত, কুরাইশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি অনুযায়ী তাদের জন্য সত্য স্পষ্ট হওয়া বা তাদের শাস্তি পাওয়ার যৌক্তিক প্রমাণাদি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক ছিল, আর এর জন্য অবকাশ আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ছিল যে, মুসলমানরা যেন ধৈর্য ও ক্ষমার সেই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যার পর চুপ থাকা আত্মহত্যার নামান্তর হবে, যা কোনো বুদ্ধিমানের নিকট সুন্দর কাজ বিবেচিত হতে পারে না। তৃতীয়ত, মক্কায় কুরাইশের এক ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল আর মহানবী (সা.) সেই শহরের একজন নাগরিক ছিলেন। কাজেই সুনাগরিক হওয়ার দাবি ছিল, যতদিন মক্কায় অবস্থান করতেন উক্ত সরকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং স্বয়ং কোনো শান্তি ভঙ্গকারী বিষয় ঘটতে না দেয়া। বিষয় যখন ক্ষমার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি যেন সেখান থেকে হিজরত করে চলে যান। চতুর্থত, এটিও আবশ্যক ছিল যে, যতদিন খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর জাতি তাদের কৃতকর্মের ফলে শাস্তি যোগ্য না হবে ও তাদেরকে ধ্বংস করার সময় না এসে যাবে ততদিন পর্যন্ত তিনি (সা.) যেন তাদের মাঝেই অবস্থান করেন। আর যখন সেই সময় এসে যায় তখন তিনি যেন সেখান থেকে হিজরত করেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি অনুযায়ী নবী যতদিন পর্যন্ত নিজ জাতির মাঝে উপস্থিত থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক শাস্তি আসে না। আর যখন ধ্বংসাত্মক শাস্তি আসার সময় হয় তখন নবীকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এসব কারণে মহানবী (সা.)-এর হিজরত নিজের মাঝে বিশেষ ইঙ্গিত বহন করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সীমালঙ্ঘনকারী জাতি তা চিনতে পারে নি, বরং অত্যাচার ও নির্যাতনে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। নতুবা যদি তখনও কুরাইশরা বিরত হতো এবং ধর্মের বিষয়ে জোর খাটানো পরিত্যাগ করত আর মুসলমান দেরকে শান্তিতে জীবন যাপন করার সুযোগ দিত তাহলে খোদা হলেন আরহামুর রাহিমীন বা সচয়ে বড় দয়ালু আর তাঁর রসূলও রহমাতুল্লিল আ'লামীন তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হতো আর আরবকে সেই রক্তপাতের দৃশ্য দেখতে হতো না যা তারা দেখেছে। কিন্তু ভাগ্যের লেখা পূর্ণ হওয়ার ছিল। মহানবী (সা.)-এর হিজরত কুরাইশের শত্রুতার আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করেছে। তারা পূর্বের চেয়েও প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

যেসব দরিদ্র ও অসহায় মুসলমান মক্কায় ছিল তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো ছাড়াও কুরাইশরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হলো, যখনই তারা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে নির্বি ঘ্নে বেরিয়ে গেছেন; (তখন) তারা মহানবী (সা.) -এর সন্ধানে বের হয় আর মক্কা উপত্যকার প্র ত্যেকটি কোণায় তাঁর (সা.) সন্ধান করে এমনকিসওর গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সাহায্য করেন আর কুরাইশদের চোখে এমন পর্দা লেপন করেন যে, একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছেও তারা ব্যর্থ ও বিফল হয়ে ফিরে যায়। তারা যখন এই অনুসন্ধানে হতাশ হয় তখন তারা সাধারণ ঘোষণা প্রদান করে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট, যা বর্তমান মূল্যে প্রায় বিশ হাজার রুপি হয়, (এটি সেই যুগের কথা যখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এটি লিখেছেন, অর্থাৎ ১৯৩১ সালের কথা; বর্তমানে এটি কোটি কোটি টাকার বিষয়; তাকে একশ' উট দেওয়া হবে। অর্থাৎ কোটি টাকার পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়।) উক্ত পুরস্কারের লোভে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক তাঁর (সা.) সন্ধানে চতুর্দিকে বের হয়ে যায়। যেমন সুরাকা বিন মালেকের পিছু ধাওয়া করা উক্ত পুরস্কারের ঘোষণার কারণেই ছিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রেও কুরাইশকে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়েছে। যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দু'টি জাতির মাঝে যুদ্ধ বাধার জন্য শুধুমাত্র এই একটি কারণই যথেষ্ট যে, কোনো জাতির মনিব ও নেতার মাথার মূল্য হিসেবে অন্য জাতি এভাবে পুরস্কার নির্ধারণ করবে। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৯৮-৩০০, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ)

অনুরূপভাবে যখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন কুরাইশরা মদীনার নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সহচরদের নামে হুমকি দিয়ে একটি পত্র প্রে রণ করে। তারা লিখেছে যে,তোমরা আমাদের সাথীকে আশ্রয় দিয়েছো, আর আমরা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে হবে অথবা তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অন্যথায় আমরা সবাই সমবেত হয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব আর তোমাদের নারীদের আমাদের অধীনস্ত করব। আ ব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার প্র তিমাপূজারী সঙ্গীরা যখন এই পত্র পায় তখন তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এ সংবাদ লাভ করেন তখন তিনি তাদের সাথে সা ক্ষাৎ করেন এবং বলেন, কুরাইশরা তোমাদের যে হুমকি দিয়েছে তা তোমাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় হুমকি। অথচ তারা তোমাদের ততটা ক্ষতিসাধন করতে পারবে না যতটা তোমরা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করবে। তোমরা কি নিজেদের পুত্র ও ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও? যেহেতু তাদের মধ্য থেকে অনেকেই মু সলমান হয়ে গিয়েছিল তাই ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর এসব কথা শোনার পর এদিক সেদিক চলে যায়, অর্থাৎ তাকে (উবাইকে) ছেড়ে যায়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, হাদীস-৩০০৪)

অপরদিকে মক্কার কুরাইশরা ঘুরে ঘুরে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করে। যেমন এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেন,কথার এখানেই শেষ নয়, বরং কুরাইশরা যখন দেখল যে, অওস ও খাযরাজ গোত্র মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত হবে না এবং মদী নায় ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তারা আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে আরম্ভ করে। আর কাবা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে কুরাইশের যেহেতু সমগ্র আরব গোত্রগুলোর ওপর এক বিশেষ প্রভাব ছিল তাই কুরাইশের উস্কানিতে বেশ কয়েকটি গোত্র মুসলমানদের প্রাণের শত্রুতে পরিণত হয়। আর মদীনার অবস্থা এমন হয়ে যায় যেন এর চতুষ্পার্শ্বে কেবল আগুন আর আগুন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৯৮-৩০১, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ)

যেমনটি এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহবীগণ মদীনায় আগমন করেন এবং আনসাররা তাঁদেরকে আশ্রয় দেয় তখন সমগ্র আরব একটি ধনুকের ন্যায় অর্থা ৎ একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। অতএব সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা রাতের বেলাও অস্ত্র সাথে নিয়ে ঘুমাত আর দিনের বেলাও সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করত। তারা একে অপরকে বলত যে, দেখুন! আমরা সে সময় পর্যন্ত বাঁচব কিনা জানি না যখন আমাদের শান্তি তে রাত্রি যাপনের সুযোগ লাভ হবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৩৫১২)

স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কেমন ছিল দেখুন! হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) প্রথম প্রথম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন।

(আস সুনানুল কুবরা লিন নিসাঈ, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৮২১৭)

এ যুগ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(সূরা আনফাল: ২৭) অর্থাৎ "হে মুসলমানরা! সেই যুগকে স্মরণ করো যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে এবং তোমরা দেশে অনেক দুর্বল গণ্য হতে আর তোমরা এই ভয়ে ভীত থাকতে যে, লোকেরাছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ধ্বংস না করে দেয়। অতঃপর খোদা তা'লা তোমাদের আশ্রয় দেন এবং নিজ সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদের সমর্থন করেন আর তোমাদের জন্য পবিত্র রিয্ক এর দ্বার উন্মুক্ত করেন। সুতরাং তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

এগুলো ছিল বহিরাগত আশঙ্কা, যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনার অভ্যন্তরিণ অবস্থাও ততটা অনুকূল ছিল না।

যেমনটি কি-না এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,মদীনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা ছিল তা হলো, অওস ও খাযরাজ গোত্রের এক বৃহদাংশতখনও শির্ক-এ প্রতিষ্ঠিত ছিল আর বাহ্যত যদিও তারা নিজ ভাই-বন্ধুদের সাথে ছিল কিন্তু অবস্থার দোলাচালের মাঝে একজন মুশরিকের বিশ্বাসই বা কি! আর দ্বিতীয়ত ছিল মুনাফিকরা, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পর্দার অন্তরালে তারা ছিল ইসলামের শত্রু আর মদীনায় তাদের উপস্থিতি ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ ছিল। তৃতীয়ত ছিল ইহুদীরা,যাদের সাথে যদিও একপ্র কার সন্ধিচুক্তি হয়েছিল কিন্তু ঐসব ইহুদীর দৃষ্টিতে সেই সন্ধিচুক্তির কোনো মুল্যই ছিল না। মোটকথা, এসব বাস্ত বতার নিরিখে বলা যায়, স্বয়ং মদীনার অভ্যন্তরে এমন সব কারণ বিদ্যমান ছিল যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক গোপন বারুদের ভাণ্ডারের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না আর আরব গোত্রগুলোর সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই বারুদে আগুন লাগানো এবং মদীনার মুসলমানদের নিমিষেই উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে যার চেয়ে স্পর্শকাতর পরিস্থিতি ইসলামে আর কখনো আসে নি, মহানবী (সা.)-এর প্রতি খোদা তা'লার ওহী অবতীর্ণ হয় যে, এখন তোমাদেরও ঐসব কাফিরের মোকাবিলায় তরবারি ধারণ করা উচিত যারা সম্পূর্ণ অন্যায়ের বশে তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা হয়ে যায়। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩০২)

তরবারির জিহাদের বিষয়ে সর্বপ্র থম আয়াত মহানবী (সা.)-এর প্রতি ২য় হিজরীর ১২ই সফর অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে অবতীর্ণ হয় যখন কিনা মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩০৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যে গবেষণা করেছেন তদনুযায়ী সেই আয়াতের (অবতরণকাল) উক্ত তারিখ নির্ণীত হয়, কেননা এ সূরা সম্পর্কে (লেখা আছে) যে, কিয়দাংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কতক মদীনায়। যাহোক, উক্ত আয়াতের অবতরণকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এমন রেওয়ায়েতও আছে যে, হিজরতের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

(তফসীর কুরতবী, তফসীর সূরা হজ্জ, পৃ: ২১১০)

কেননা মদীনায় আগমনের কিয়দকাল পরেই মহানবী (সা.) মদীনার আশপাশে কুরাইশ কাফেলাকে প্রতিহত করা এবং নিরাপত্তামূলক অন্যান্য দিক মাথায় রেখে সশস্ত্র দল প্রেরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই আয়াত হিজরতের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হোক বা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হোক- ধর্মের বিরুদ্ধেঅস্ত্রধারীদের সাথে যুদ্ধ করার এটিই ছিল প্রথম অনুমতি। আর মহানবী (সা.) সেই (মক্কা) রাষ্ট্রের বাইরে চলে এসেছিলেন, পূর্বে যে রাষ্ট্রের অধীনে ছিলেন। যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক থাকা অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করার অনুমতি নেই এবং তাঁর (সা.) নিজস্ব এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেই আয়াত যাতে আল্লাহ্ তা'লা (আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার) অনুমতি দিয়েছেন সেটি হলো সূরা হাজ্জের আয়াত বরং দু'টি আয়াত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন , ?????????????????????? (সূরা হাজ্জ: ৪০-৪১)অর্থাৎ, যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'দের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (অর্থাৎ) সেইসব লোক যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত না করা হতো তাহলে সাধুসন্ন্যাসীদের মঠ ও গীর্জা এবং ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেওয়া হতো আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেওয়া হতো) যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অনেক বেশি স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী। অর্থাৎ এখানে সব ধর্মমতের ইবাদতগাহের নাম নিয়ে সকল ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

জিহাদ ফরজ হওয়ার পর মহানবী (সা.) কাফেরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রথমে চারটি কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন এসব কৌশল সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,প্রথমত তিনি (সা.) স্বয়ং সফর করে আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তামূলক চুক্তি করতে আরম্ভ করেন যেন মদিনার আশেপাশের এলাকা বিপদমুক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বিশেষভাবে সেসব গোত্রকে প্রাধান্য দেন যারা কুরাইশদের সিরিয়া যাতায়াতের পথে বসবাস করত। কেননা সবার জন্য এটি বোধগম্য যে এসব গোত্রের কাছ থেকেই মক্কার কুরাইশরা মু সলমানদের বিরুদ্ধে বেশি সাহায্য নিতে পারত এবং যাদের শত্রুতা মুসলমানদের জন্য চরম বিপদের কারণ হতে পারত।

দ্বিতীয়ত তিনিছোট ছোট সংবাদ সংগ্রাহক দল মদিনার আশপাশের এলাকাগুলোতে প্রেরণ করা আরম্ভ করেন যেন তিনি কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারেন অধিকন্তু কুরাইশরাও যেন জানতে পারে যে, মুসলমানরা অসতর্ক নয় আর এভাবে মদিনা অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। ঐ দলগুলো পাঠানোর তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল যেন এর মাধ্যমে মক্কা ও আশেপাশের দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমানদের মদিনার মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হবার সুযোগ লাভ হয়। তখনও মক্কার এলাকায় বহু এমন লোক ছিল যারা অন্তরে মুসলমান ছিল, কিন্তু কুরাইশদের অত্যাচারের কারণে তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে পারত না আর দারিদ্র্য ও দুর্বলতার কারণে হিজরতের সামর্থ্যও তাদের ছিল না। কেননা কুরাইশরা এসব লোকদের হিজরতে বলপূর্বক বাধা দিত।.....

চতুর্থ যে কৌশল তিনি অবলম্বন করেন সেটি হচ্ছে কুরাইশদের সেসব বানিজ্যিক কাফেলাগুলোর পথ রোধ করা আরম্ভ করেন যেগুলো মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে আসা যাওয়ার পথে মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। কেননা এসব কাফেলা যে পথেই যাতায়াত করত সেখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ছড়াত আর এটা স্পষ্ট যে, মদিনার আশেপাশে ইসলামের শত্রুতার বীজ বপন করা মুসলমানদের জন্য খুবই বিপজ্জনক ছিল। এছাড়াও এই কাফেলাগুলো সর্বদা সশস্ত্র থাকত এবং যে কেউ বুঝতে পারবে যে, এ ধরনের কাফেলার মদিনার এত পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করা কখনো মুসলমানদের জন্য ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। এছাড়া এও সত্য যে,কুরাইশদের জীবিকার বেশিরভাগই ব্যবসানির্ভর ছিল। এমতাবস্থায় কুরাইশদের দমন, তাদের নিষ্ঠুর কাজে বাধা দেয়া ও মিমাংসায় আসতে বাধ্য করার সবচেয়ে কার্যকর, নিশ্চিত ও ত্বরিত উপায় ছিল তাদের ব্যবসার পথ বন্ধ করে দেয়া। অতএব ইতিহাস সাক্ষী, যে বিষয়গুলো কুরাইশদেরকে পরিশেষে সন্ধির দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছিল সেগুলোর মধ্যে তাদের বানিজ্য কাফেলাগুলোকে প্র তিরোধ করা ছিল অন্যতম। সুতরাং এটি খুবই বিচক্ষণ কৌশল ছিল যা যথাসময়ে ফল বয়ে এনেছিল। এছাড়া কুরাইশদের এই কাফেলাগুলোর মুনাফা প্রায় সময় ইসলামকে নির্মূল করার চেষ্টায় ব্যয় করা হতো। বরং কিছু কাফেলা বিশেষভাবে এজন্যই প্রেরণ করা হতো যে লব্ধ পুরো মুনাফা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যায় করা হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা হতো ও আয় করা হতো। এ ক্ষেত্রে সবাই বুঝতে পারবে যে, এই কাফেলাগুলোকে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণভাবে একটি বৈধ উদ্দেশ্য ছিল।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩২৩-৩২৪)

যাহোক, এই ধারাবাহিক বর্ণনা চলতে থাকবে। বা কি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। তাদের জানাযার নামাযও হবে। এদের মধ্যে একজনের জানাযা হাযের হবে যা মুকার্‌রম খাজা মুনিরুদ্দীন কমর সাহেবের। বাকিগুলো হবে গায়েবানা জানাযা। খাজা মুনিরুদ্দীন কমর সাহেব এখানে যুক্তরাজ্যেই থাকতেন। তিনি গত ২৭ মে তারিখে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া খায়রুদ্দিন সেখওয়ানী সাহেব (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন। তার পিতা মওলানা কামরুদ্দীন সাহেবকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অল্প বয়সে দেখেছিলেন এবং তিনিও তাঁকে অল্প বয়সে দেখেছিলেন অর্থাৎ শৈশব ছিল। তার পিতা মৌলবি কামরুদ্দীন সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কেন্দ্রীয় সদর ছিলেন। দেশ বিভাগের পর, অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার পর তারা পাকিস্তান চলে আসেন। এরপর খাজা মুনিরুদ্দীন সাহেব কিছুদিনের জন্য আফ্রিকার তানজানিয়ায় চলে যান। রাবওয়াতেও তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, এরপর তিনি ১৯৬৬ সালে সপরিবারে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে ফজল মসজিদের কাছে তার বাসস্থান ছিল। প্রবীণরা সবাই তাকে চেনেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে ফজল মসজিদে জুমুআর নামাযে আযান দেওয়ার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। মরহুম ফজল মসজিদ, লন্ডন ও পাটনী জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯৫ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি জীবনোৎসর্গ করেন এবং বিগত ২৯ বছর ধরে তিনি যুক্তরাজ্যে অবৈতনিকভাবে প্রথমে ওকালতে তবশীরে এবং পরে প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর একদিন আগেও তিনি যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত অফিসে কাজ করতে থাকেন আর এরপর নামায পড়ে বাসায় ফিরেছিলেন। তিনি নিয়মিত পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত, নীরব প্রকৃতির, সহানুভূতিশীল, মিশুক, পুণ্যবান, আন্ত রিক এবং বিশ্বস্ত একজন মানুষ ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতও করেছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী রয়েছে। তিনি যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবের মামাও ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন। এটি জানাযা হাযের, যা ইনশাআল্লাহ্ পড়া হবে।

অন্য যেসব গায়েবানা জানাযা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ডা. মির্জা মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের জানাজা। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পৌত্র এবং ডা. মির্জা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব ও মাহমুদা বেগম সাহেবার পুত্র ছিলেন আর হযরত নবাব মোবারকা বেগম সাহেবার দৌহিত্র ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি রাবওয়া থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন, পরে তিনি লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করেন। কিছুকাল রাবওয়ার হাসপাতালে কাজ করেন তারপর পড়াশোনার জন্য যুক্তরাজ্যে আসেন এবং ১৯৭০ সালে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস এডিনবার্গ থেকে স্নাতকোত্তর করেন এবং এফআরসিএস পাস করেন। তিনি যেহেতু ওয়াক্‌ফ ছিলেন, (তাই পাকিস্তানে) ফিরে যান এবং সেখানে ফযলে উমর হাসপাতালে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। তিনি প্রায় ৫০ বছর ফযলে উমর হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সেখানে যাঁরা কাজ করেছেন, নুসরাত জাহার অধীনে যেসব চিকিৎসক কাজ করেছেন, অর্থাৎ ওয়াকেফীনে জিন্দেগী ডাক্তারদের মাঝে তিনি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। হয়ত ডা. মির্জা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব এর চেয়েও অধিক সময় কাজ করে থাকবেন। যাহোক তিনি ৫০ বছর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে ওয়াকফে জাদীদ বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করেন আর আমৃত্যু তিনি ওয়াকফে জাদীদ বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

তার স্ত্রী লিখেন, তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। সুখ বা দুঃখের কোনো উপলক্ষ্যেই বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন এবং আমার বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ তিনি কখনো ছেড়েছেন, এমনটি আমার মনে পড়ে না। এছাড়া দায়িত্বভারও নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিতেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই শৈথিল্য দেখাননি। পরিবারের যত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য ছিলেন তদের সবার চিকিৎসা করার তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অসুস্থদের খোঁজখবর নিতেন। এভাবে অভাবীদের সব ধরনের সাহায্য করতেন। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিনি কখনোই খালি হাতে ফেরাননি। অনেক মেয়ের পড়াশোনা করিয়েছেন এবং বিবাহ অবধি তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। কোনো কোনো মেয়ে তো আমাকেও লিখেছে যে, তারা তার ঘরে থাকত। তিনি নিজ কন্যার ন্যায় তাদের লালনপালন করে তারপর তাদের বিয়ে দিয়েছেন। অনেক রোগীকে ফি না নিয়েই চিকিৎসা করতেন। এ বিষয়েও অনেকেই আমাকে লিখেছে, বরং নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঔষধ এবং নগদ অর্থও দিয়ে দিতেন। খলীফাদের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। খলীফাদের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের সাথে অনেক বেশি সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। সন্তানদেরও এ বিষয়ে তাগাদা দিতেন আর নিজের জীবনেও এটি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

আমার চেয়ে বয়সে ছয়-সাত বছর বড় ছিলেন। কিন্তু (তা সত্ত্বেও) খলীফা হওয়ার পর সর্বদাই আমার প্রতি তার মাঝে শ্রদ্ধা ও ভক্তি লক্ষ্য করেছি। বরং এর পূর্বেও যখন আমি নাযেরে আলা ছিলাম তখনও অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ আচরণ করতেন।

তার সহধর্মিণী লিখেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর স্ত্রীর অন্তিম শয্যায় একদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ফোন আসে যে, ডাক্তার মুবাশ্বেরকে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। তিনি বলেন, এ খবর শুনে রাতারাতি তিনি

(লন্ডনের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়েন আর তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শ্রদ্ধেয়া হযরত আসেফা বেগম সাহেবার মৃত্যুতে বলেছিলেন, মুবাশ্বের আমাকে লিফটের কাছে নিতে এলে আমি মুবাশ্বেরকে দেখতেই বুঝতে পারি, আমার স্ত্রী আর নেই, কেননা আমি জানি, অসুস্থ অবস্থায় মুবাশ্বের তাকে কখনো একা পরিত্যাগ করত না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর অসুস্থতার সময়ও তিনি চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে আসা যাওয়া করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও একস্থানে তাঁর অসুস্থতার সময় তার সেবার কথা উল্লেখ করেছেন।

তার স্ত্রী লিখেন, একবার তার বিরুদ্ধে কোনো ভুল অভিযোগ করা হয় যার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তখনও তিনি যুগ খলীফার ও নেযামের সম্মান করেন এবং কোনো ধরনের অযৌক্তিক কথা বা আচরণ করেন নি। কমিটি পূর্ণ তদন্ত করার পর তাকে নির্দোষ আখ্যায়িত করে।

তার বড় ছেলে লিখেন, চিনোওট এবং এর আশপাশের এলাকার অনেক বিরোধী গোপনে তার বাড়িতে এসে চিকিৎসা নিত। তার অনেক অ-আহমদী রোগী ছিল, এ সম্পর্কে আমিও জানি। অত্র অঞ্চলে তিনি অসংখ্য মানুষের চিকিৎসা করেছেন। তাই এ অঞ্চলে রাবওয়া এবং হাসপাতালেরও অনেক খ্যাতি ছিল।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে ঔষধ সেবনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চামচ ব্যবহার করতেন হযরত আম্মাজান (রা.) সেই চামচটি হযরত উম্মে নাসের সাহেবাকে দিয়ে বলেন, যে ছেলে ডাক্তার হবে তাকে দিবে। এটি একটি ছোট চায়ের চামচ ছিল। অতএব সেই চামচ মরহুমের পিতা মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব পেয়েছিলেন এবং তার পরে সেই চামচটি মরহুমের কাছে ছিল। ডাক্তার মুবাশ্বের সাহেব মাঝে মাঝে বরকতের খাতিরে তার রোগীদেরকেও সেই চামচ দিয়ে ঔষধ পান করাতেন।

(তাঁর মৃত্যুতে) সমবেদনা জানানোর জন্য আসা লোকদের মধ্যে সকল শ্রেণির মানুষ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক বড় একটি সংখ্যা দরিদ্র শ্রেণির লোক ছিল আর তারা বার বার বলছিল, মিয়া সাহেব আমাদের প্র তি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ছিলেন। তিনি তাদের কারো চিকিৎসা করেছেন আর কাউকে অন্য কোনো উপায়ে সাহায্য করেছেন। অত্র অঞ্চলে অনেক কৃষক রয়েছে। তাদের স্ত্রী, বোনেরা চিকিৎসার জন্য তার কাছে আসত। সেসব কৃষক এসে সমবেদনা প্রকাশ করে বলেছে যে, তিনি আমাদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন! এসব অআহমদীরাও এসে কেঁদে কেঁদে বলছিল, আমাদের মাথার ওপর থেকে বাবার ছায়া উঠে গেছে।

আমাদের হাসপাতালের কর্মচারীদের অধিকাংশ আমাকেও লিখেছে যে, আমাদের হাসপাতাল এতিম হয়ে গেছে আর সবাই খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছে, আফসোস প্রকাশ করেছে। যাহোক, সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, দরিদ্রদের খেয়াল রেখেছেন। মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছেন, জানাযা যাওয়ার সময় কেউ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস-১৩৬৭) আল্লাহ্ তা'লা তাকেও এর সত্যায়নস্থল বানান।

ডাক্তার মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, আমার জানামতে জামা'তে সবচেয়ে বেশি সময় সার্ভিস প্রদানকারী ডাক্তারের সম্মান তিনিই লাভ করেছেন আর এটি ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। তিনি আরও লিখেন, তিনি যে যুগে কাজ শুরু করেছিলেন সে যুগে কোনো সাহায্যকারী কম্পাউণ্ডার বা সহকারী ছিল না। ঘরের ছিটকানি নিজেকেই লাগাতে হতো আবার নিজেকেই খুলতে হতো। রোগীকেও ডাকতে হতো। এছাড়া অন্যান্য কাজও করতে হতো। অপারেশন থিয়েটারও একাই সামলাতে হতো। এনেস্থেশিয়া দেয়ারও কেউ ছিল না। সবকিছু নিজেকেই করতে হতো। এরপর তিনি ধীরে ধীরে স্টাফদের প্রশিক্ষণ দেন। অতঃপর হাসপাতালের অনেক সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, সংক্রমনের অনুপাতও অন্য যে-কোনো প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কম ছিল। অধিকাংশ রোগী সফল চিকিৎসা করে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিত। যাহোক, তিনি দেখেছেন, আহমদী অ-আহমদী সব রোগীরতিনি খুবই সম্মান করতেন। আর এটি ব্যক্তিগতভাবে আমিও জানি।

সরকারী হাসপাতালে কর্ম রত ডাক্তার মুনীর মুবাশ্বের সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসা সেবার গণ্ডি শুধু রাবওয়াই নয়, বরং আশপাশের সব অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। তিনি বলেন, আমার পুরো চাকরিজীবন রাবওয়ার আশপাশেই অতিবাহিত হয়েছে। ইনি রাবওয়ার সরকারী ছোট ছোট হাসপাতালে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, প্রায় সব গ্রাম ও সব শহরের অনেক লোক তার ভক্ত ছিল আর আমি যেমনটি বলেছি, অগণিত অ-আহমদী লোক তার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে এসেছে।

ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেছেন, রাবওয়ায় একাকী বসবাসকারী জনৈক এক বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তার মোবাশ্বের সাহেবের ছবি নিজের ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার নূরী সাহেব তাকে দেখতে যান। খুবই শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে উক্ত অসুস্থ ব্যক্তি বলেন, ডাক্তার মোবাশ্বের সাহেব অধিকাংশ সময় আমার ঘরে এসে আমার শরীর-স্বাস্থ্য ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। আল্লাহ্ তাকে ভালো রাখুন। এটি তার জীবদ্দশার সময়কার কথা। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সেবা এবং রোগীদের অনুভূতি ও সমবেদনা সংবলিত এত চিঠি আছে যে, এগুলো সব বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। খিলাফতের সাথে অসাধারণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল, যেমনটি আমি বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অপার ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং আপন প্রিয়জনদের মাঝে তাকে স্থান দিন।

তৃতীয় জানাযা গায়েব হলো, ইসলামাবাদের সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা সৈয়্যদা আমাতুল বাসেত সাহেবার। কিছুদিন পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন***। মরহুমা ছিলেন ডাক্তার সৈয়্যদ আবদুস সাত্তার শাহ সাহেবের পৌত্রী এবং মোহতরম সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক শাহ সাহেবের কন্যা আর হযরত উম্মে তাহের (রা.)-এর ভাতিজি। মরহুমার পিতা আব্দুর রাজ্জাক শাহ সাহেব প্রথম আইরিশ আহমদী মহিলা হানিফা শাহ সাহেবাকে বিয়ে করেছিলেন যার পূর্বনাম ছিল ক্যাথলিন ও'ব্রায়েন। এই বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৫ সনে কেনিয়ার নায়রোবিতে। এরপর মরহুমার মা পাকিস্তানে চলে আসেন। শাহ সাহেব পাকিস্তানের সিন্ধুতে পদায়িত হন আর সেখানে তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। শাহ সাহেবের স্ত্রী আয়ারল্যাণ্ডবাসিনী হওয়া সত্ত্বেও এই ছোট গ্রামে অনেক কুরবানী করে জীবন যাপন করেন আর তাদের সন্তানরাও অনেক ত্যাগী মনমানসিকতার ছিল যাদের একজন ছিলেন এই মরহুমা আমাতুল বাসেত সাহেবা।

তার স্বামী সৈয়্যদ মাহমুদ শাহ সাহেব বলেন, মরহুমা নামায এবং বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করতেন এবং শৈশব থেকেই তার পিতার সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করে চলতেন এবং ধার্মিক মহিলা ছিলেন। সর্বদা দরিদ্র ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা করতেন। পর্দার অনুশাসন অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্রসন্তান রেখে গিয়েছেন। তার এক ছেলে সৈয়্যদ বশীর আহমদ এখানেই (যুক্তরাজ্যে) থাকেন। আরেক ছেলে আছে সৈয়্যদ শাহেদ আহমদ। তার কন্যা মজিদা মালিক আমেরিকায় থাকেন। তার কন্যা মজিদা মালিক আমেরিকা নিবাসী ডাক্তার আহমদ মালেক সাহেবের স্ত্রী। তিনি বলেন, আমার মা সর্বজনপ্রিয় এবং সদা উৎফুল্ল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। তার সাথে যে-ই সাক্ষাৎ করত সে-ই তার ভক্ত হয়ে যেত। খিলাফতের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। তিনি ছিলেন খুবই পবিত্র স্বভাবের, কুশলী এবং ভদ্র ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী। নিজের কোনো দুঃখ-কষ্ট কখনোই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন না। দরিদ্রদের সাহায্য আর দান খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। দরিদ্র মেয়েদের বিয়ে-শাদীর জন্য সাহায্য, অভাবীদের বাড়িতে রেশন পৌঁছানো, এতিমদের পড়াশোনার খরচ বহন করা, দরিদ্রদের আহার করানো, মোটকথা নিজের সময় তিনি আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের সাহায্য-সহযোগিতা করায় ব্যয় করতেন, সেটি দোয়ার আকারে হোক বা সদকা করার আকারেই হোক। অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'লা এবং ঐশী সাহায্যের বিষয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করতেন এবং তার বন্ধুত্বও এমন লোকদের সাথে হতো যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসত। তার সাথে আল্লাহ্ তা'লারও এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করতেন, আর অনেক বিষয়ে পূর্বে ই আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগাম সংবাদও দিয়ে দিতেন। চরম অসুস্থতায়ও তিনি নামায পরিত্যাগ করেননি আর সর্বদা ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখতেন, পাছে নামায ছুটে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

তৃতীয় জানাযা গায়েব হলো শরীফ আহমদ বন্দেশা সাহেবের, যিনি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের চক নং ২৬১ আরবে আদুওয়ালী জামা'তের প্রে সিডেন্ট ছিলেন। তিনিও গত কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন*** । তার ছেলে মুরব্বী সিলসিলা রহমতুল্লাহ্ বন্দেশা সাহেব বলেন, আমাদের দাদার দুই-তিন মাস বয়সে দাদার পিতামাতা ও অন্য সব নিকট আত্মীয়স্বজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে প্লেগের সময় মৃত্যু বরণ করে। তখন দাদার দূর-সম্পর্কে র এক আহমদী পরিবার তার প্রাথমিক লালন পালন করেন। এরপর বাটালা তহসীলের এক বিচারকের রায় অনুযায়ী দাদার বেশি কাছের আত্মীয় এক আহমদী পরিবারে তিনি লালিত পালিত হন। এভাবে তিনি (অর্থাৎ শরীফ আহমদ সাহেবের বাবা) আহমদী পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। মরহুম প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত গ্রামে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অগণিত গুণাবলীর অধিকারী, দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইবাদতে উন্নত মার্গের অধিকারী, অসহায় এবং বিশেষত নিকটাত্মীয়দের সাহায্যকারী, খিলাফত ও জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা পোষণকারী মানুষ ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পাঁচ পুত্র আর তিনজন কন্যা তিনি রেখে গিয়েছেন। যেমনটি আমি পূর্বে ই উল্লেখ করেছি, তার এক ছেলে রহমতুল্লাহ্ বন্দেশা সাহেব মুবাল্লেগ সিলসিলাহ, যিনি বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতেশিক্ষক হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন, আর তার গ্রামের বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে পিতার জানাযা ও দাফনের কাজে যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন আর তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সব সন্তানদের তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

জুমআর খুতবা

“শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। ”

“ তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী সেবক পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই পরবর্তী প্রজন্ম ও বংশধর হবে। ”

সেই পুত্রের আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া, মেধাবী ও বিচক্ষণ হওয়া ও অন্যান্য বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে আপন পর সবাই স্বীকারোক্তি দেয় এবং খুব ভালোভাবে জানে। আর অ-আহমদীরা প্রকাশ্যে এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

“এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন অধ্যয়নের একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আপনি সৃষ্টি করেছেন। আর এই তফসীর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একেবারে প্রথম তফসীর যাতে যুক্তি ও শাস্ত্রকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে। আপনার জ্ঞানের গভীরতা, আপনার দৃষ্টির গভীরতা, আপনার অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও বিচক্ষণতা, আপনার দলীল প্রদানের সৌন্দর্য এর এক একটি শব্দ থেকে প্রতিভাত হয়। ” (আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী)

“আহরারীরা কান খুলে শোনো! তোমরা এবং তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গরা কিয়ামত পর্যন্ত মির্যা মাহমুদের মোকাবিলা করতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে কুরআনের জ্ঞান আছে। তোমাদের কাছে এমন কী আছে?”

“আমি দাবী করে বলতে পারি, মুসলমান অথবা অমুসলিম ইতিহাসবীদদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন যারা হযরত উসমান (রা.) এর যুগের মতবিরোধের মূলকারণ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এবং এ ভয়ংকর ও প্রথম গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্জা সাহেব কেবল গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ বুঝতে সক্ষম হন নাই বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে সেসব কারণ ও ঘটনাসমুহ বর্ণনা করেছেন যার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খেলাফতের প্রাসাদ নড়বড়ে ছিল।”

(সৈয়্যদ আব্দুল কাদির সাহেব)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বিষয়গুলো ভবিষ্যতবাণীতে উল্লেখ করেছিলেন অথবা বলা উচিত যে, আল্লাহ তালা তিনি (আ.)-কে (যা) বলেছেন তা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্ত্বায় পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ তালা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলেন, কো্ন বড় আলেম-ও তার মোকাবেলা করতে পারত না। তাঁর (রা.) প্রদত্ত বক্তব্য জামাতের একটি ধনভান্ডার।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (১৭ই তবলীগ ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তা’ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যেমনটি প্রত্যেক আহমদী জানে যে, ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনটি (আমাদের) জামা’তে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বরাতে স্মরণ করা হয়। আর এই উপলক্ষ্যে জামা’তসমূহে জলসাও উদ্‌যাপিত হয়। এবার ২০শে ফেব্রুয়ারি তিন দিন পরে আসবে, কিন্তু আমি যথোপযুক্ত মনে করেছি যে, আজকের খুতবায় এসম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করব।

এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরে এক পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণ (সম্পর্কে) ছিল, যে বহু গুণের আধার হবে। আল্লাহ্ তা’লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন সে লাভ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, সম্মানিত ও মহামহিম আল্লাহ্ তা’লার এলহাম এবং সংবাদ অনুযায়ী প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী হলো, “পরমদয়ালু ও করুণাময় এবং সুমহান খোদা, যিনি সবকিছুর ওপর আধিপত্য রাখেন , (যিনি মহা মর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী), আমাকে নিজ এলহাম দ্বারা সম্বোধন করে বলেন, আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। অতএব আমি তোমার আকুতি-মিনতি শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি আর তোমার (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম।

খোদা একথা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে। আর যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়। আর সত্য স্বীয় সকল কল্যাণসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে, আমিই সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। আর তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আর যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী; এবং খোদা, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে এবং অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়। অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী সেবক পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই পরবর্তী প্রজন্ম ও বংশধর হবে।

সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে, তার নাম হবে আমানুয়েল ও বশীর। তাকে পবিত্রাত্মা দেয়া হয়েছে এবং সে পঙ্কিলতামুক্ত আর আল্লাহ্‌র জ্যোতি। কল্যাণময় সে- যে উর্দ্ধলোক থেকে আসে। তাঁর সঙ্গে ‘ফযল’ থাকবে যা তার আগমনের সাথে আসবে। সে প্রতাপের অধিকারী, ঐশ্বর্যশালী ও সম্পদশালী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং স্বীয় নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য ও ‘পবিত্র আত্মার’ কল্যাণে অনেক কে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, কারণ খোদার করুণা ও প্রবল মর্যাদাবোধ তাকে মর্যাদার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছে। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাবান ও কোমলমতি হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝতে পারি নি)। সোমবার, শুভ সোমবার। স্নেহাস্পদ ও সম্মানিত প্রিয় পুত্র।

(مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِر، مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَأَنَّ اللهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ۔)অনাদি ও অনন্ত সত্তার এবং সত্য ও মাহাত্ম্যের বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্ স্বয়ং উর্দ্ধলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। যার আগমন অত্যন্ত কল্যাণময় এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি! যাকে খোদা তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন পবিত্র আত্মা ফুৎকার করব এবং খোদার ছায়া তার শিরে বিরাজমান থাকবে। সে তাড়াতাড়ি বড় হবে আর বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে। এরপর সে তার আত্মিক উন্নতির পরম মার্গে উত্তোলিত হবে। ''وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا۔ (অর্থাৎ এটি একটি অবধারিত বিষয়)'। (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৭)

সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই সময়ের ভেতরেই যা তিনি (আ.) উল্লেখ করেছিলেন একজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে যার নাম হচ্ছে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)। যাকে আল্লাহ্ তা'লা খলীফাতুল মসীহ্ সানীর মসনদেও অধিষ্ঠিত করেন। এরপর এক দীর্ঘ সময় পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করে এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর যে পুত্রের মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– সেই পুত্র হলাম আমি'।

সেই পুত্রের আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া, মেধাবী ও বিচক্ষণ হওয়া ও অন্যান্য বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে আপন পর সবাই স্বীকারোক্তি দেয় এবং খুব ভালোভাবে জানে। আর অ-আহমদীরা প্রকাশ্যে এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র জ্ঞানমূলক ও বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করব।

আমি যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এগুলো শুনার পূর্বে এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, তাঁর শৈশব স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বলতার মাঝে কেটেছে, ব্যাধির মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। চোখের সমস্যা ইত্যাদিও ছিল। দৃষ্টিশক্তিও এক সময় ক্ষীণ হতে থাকে। এরপর এক চোখে (দেখতে পেতেন)।

এছাড়া জাগতিক শিক্ষার দিক থেকেও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় না থাকার মতো ছিল। তিনি স্বয়ং বলেন যে, বড় কষ্টে আমি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তাঁকে ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে পূর্ণ করা হবে। তাই এমনসব অসাধারণ ও বিস্ময়কর বক্তৃতামালা ও খুতবা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্বারা প্রদান করিয়েছেন আর এমন এমন প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন যেগুলো নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত আর অ-আহমদীরাও সেগুলোর স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

আজ আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। এই উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপনের পূর্বে আমি তাঁর লেখনী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, খুতবা এবং মজলিসে এরফান ইত্যাদির পরিমাণ ও স্থূলতার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছি। যেসব বইপুস্তক, বক্তৃতা, ভাষণ, প্রবন্ধ, বাণী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে অথবা এখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ছাপানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে অর্থাৎ আনোয়ারুল উলূম আকারে যেসব বক্তৃতা ও ভাষণ রয়েছে, এর মোট ৩৮টি খণ্ড হবে এবং এগুলোর সংখ্যা হলো ১৪২৪। আর এর মোট পৃষ্ঠা হলো প্রায় ২০৩৪০, অর্থাৎ আনুমানিক এতটা হবে। তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীরসহ অন্যান্য তফসীরমূলক অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ২৮৭৩৫। খুতবা জুমুআ রয়েছে ১৮০৮টি যেগুলোর মোট পৃষ্ঠা হচ্ছে ১৮৭০৫। ঈদুল ফিতরের খুতবা রয়েছে ৫১টি যেগুলোর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৩। ঈদুল আযহার খুতবা রয়েছে ৪২টি যেগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যাহলো ৪০৫। বিয়ের খুতবা রয়েছে ১৫০টি যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮৪। শুরার বক্তৃতামালা প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা হলো ২১৩১। এছাড়াও আরো আছে। এই সমস্ত পৃষ্ঠাকে একত্রিত করলে মোট প্রায় ৭৫,০০০ পৃষ্ঠা দাঁড়ায়। 'রিসার্চ সেল' আল হাকাম ও আল -ফযল পত্রিকার ১৯১৩ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে যাচাই বাছাই করেছে, তাদের ভাষ্য হলো, আরো কিছু বিষয় সামনে এসেছে যেগুলো এখনও আনোয়ারুল উলুম বা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। এই বর্ণনা অনুযায়ী ৫৫ টি প্রবন্ধ, ২৭টি বক্তৃতা, ১৪৩টি মজলিসে এরফান, ২২২টি মলফুযাত বিষয়ক প্রবন্ধ এবং ১৩১টি পত্রাবলী এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এগুলো জ্ঞানের অনেক বড় এক ভাণ্ডার।

এখন আমি প্রথমে তার জ্ঞানমূলক কর্মযজ্ঞের মধ্য থেকে কুরআন করীমের অনুবাদ ও তফসীর সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং এ সম্পর্কে অ-আহমদীদের মতামত বা মন্তব্য উপস্থাপন করছি।

তফসীরে কবীরে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ৫৯টি সূরার তফসীর করেছেন যেটি ১০ খণ্ড এবং ৫৯০৭ পৃষ্ঠা সংবলিত। এছাড়া তাঁর অনেক তফসীরী নোটও পাওয়া গিয়েছে যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যাও হাজারের কোঠায় আর আশা করা যায় এগুলোও কোনো সময় ছাপানো হবে। কুরআন শরীফের সাবলীল অনুবাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ তাঁর তফসীরে সগীর আকারে রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নিজের শেষ বয়সে সবচাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই তার মাধ্যমে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের একটি মানসম্পন্ন এবং সাবলীল উর্দু অনুবাদ সংক্ষিপ্ত তবে সামগ্রিক নোট সহকারে যেন মুদ্রিত হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে ইউরোপ সফর থেকে ফেরার পর যদিও হুযূরের (রা.) স্বাস্থ্য বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকতো, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রূহুল কুদুস দ্বারা তাঁর প্রতিশ্রুত খলীফার এমন জোরালো সাহায্য করেন যে, তিনি (রা.) ১৯৫৬ সালের জুন মাসে গ্রীষ্মকালে মারি অঞ্চলের পাহাড়ে যান। সেখানে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ লেখানোআরম্ভ করেন যা খোদা তা'লার অনুগ্রহে ১৯৫৬ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে আসরের সময় সম্পন্ন হয়ে যায়। আর নাখলা একটি জায়গা ছিল, যেটি কালারকাহারের নিকটে মনোরম ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াপূর্ণ ছোট একটি স্থান, সেখানে তিনি (রা.) একটি ছোট বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেন। এরপর এটিকে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। অতঃপর তৃতীয়বার দেখা হয়, লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রুফরিডিং ইত্যাদি অনেক কাজ সম্পন্ন করার পর ১৫ নভেম্বর ১৯৫৭ সনে তফসীরে সগীর মুদ্রিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়।

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১৯, পৃ : ৫২২-৫৩১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীরে সগীর প্রসঙ্গে একস্থানে বলেন, "আমার মত হলো, এখন পর্যন্ত কুরআন করীমের যতগুলো অনুবাদ হয়েছে সেগুলোর মাঝে কোনো একটি অনুবাদেও উর্দূ বাগধারা ও আরবী বাগধারার ততটা খেয়াল রাখা হয়নি যতটা এতে রাখা হয়েছে।"

সাধারণভাবেই দেখা যায় আর বিশেষত এর নোটগুলোতেও দৃষ্টিগোচর হয় যে, তিনি (রা.) অনুবাদের ক্ষেত্রেবাগধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি এত স্বল্প সময়ে এত মহান একটি কাজ সম্পন্ন করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই বৃদ্ধ ও দুর্বল মানুষের মাধ্যমে সেই মহান কাজ সম্পন্ন করিয়ে নিয়েছেন যা অনেক বড় বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও করতে পারেনি। তিনি (রা.) বলেন, বিগত তেরশো বছরে অনেক বীরপুরুষ গত হয়েছেন। কিন্তু যেই কাজ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্পন্ন করার সৌভাগ্য দিয়েছেন সেই সৌভাগ্য তাদের মাঝে কেউই লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে এই কাজ স্বয়ং আল্লাহ্ র এবং তিনি যার মাধ্যমে চান কাজ করিয়ে নেন।"

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১৯, পৃ : ৫২৫-৫২৬)

এরপর অপর এক স্থানে তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও কৃপায় কুরআন শরীফের পুরো অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ থেকে নিয়ে ওয়ান্নাস পর্যন্ত (অনুবাদ) তফসীরে সগীর আকারে (প্রকাশিত হয়েছে), যার সাথে তফসীরে কবীরের তুলনা করলে জানা যায় যে, এমন অনেক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে যা তফসীরে কবীরেও নেই। এরপর কুরআন করীমের ইংরেজী তফসীরেরও একটি বড় কাজ হয়েছে যেটিকে আমরা ফাইভ ভলিউম কমেন্টারি বলে থাকি। এই তফসীরের শুরুতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কলম দ্বারা লিখিত একটি অত্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুখবন্ধও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাঝে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থাবলীর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কুরআন মজীদের প্রয়োজনীয়তা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিত আর কুরআন সংকলন ওকুরআনী শিক্ষামালা বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও আকর্ষণীয়ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই মুখবন্ধের উপসংহারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, আমি এই ভূমিকার/মুখবন্ধের উপসংহারে মৌলভী শের আলী সাহেবের সেই সমস্ত অতুলনীয় সেবার স্বীকৃতি প্রদান করতে চাই যেগুলো তিনি শারিরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে করেছেন। একইভাবে মালেক গোলাম ফরীদ সাহেব, মরহুম খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম খান সাহেব এবং মির্যা বশীর আহমদ সাহেবেরও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য। তারা অনুবাদের তফসীর বা ব্যাখ্যার নোটে আমার বিভিন্ন বক্তৃতা, পুস্তক আর দরসের সারাংশ প্রস্তুত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর এতে তিনি এটিওলিখেছেন, আমি এ কথাও বলে দিতে চাই, হযরত খলীফা আউয়ালের (রা.)'র শিষ্য হবার কারণে আমার তফসীরে অবশ্যই এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। কাজেই, এই তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর ব্যাখ্যা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র ব্যাখ্যা এবং আমার ব্যাখ্যাও সন্নিবেশিত হবে। আর খোদা তা'লা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে আপন সত্তারপরশে সেসব জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন যা এ যুগের জন্য অপরিহার্য। তাই আমি প্রত্যাশা রাখি এই তফসীর অসংখ্য রোগীকে আরোগ্যদানের কারণ হবে।

অনেক অন্ধ এর মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি পাবে। বধিররা শুনতে আরম্ভ করবে, বোবারা (কথা) বলতে আরম্ভ করবে, খোঁড়া ও বিকলাঙ্গরা হাঁটতে আরম্ভ করবে আর আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশ্তারা তাঁর প্রবন্ধাদিকে আশিসমণ্ডিত করবেন। আর এটি সে-ই উদ্দেশ্য সম্পাদন করবে যে উদ্দেশ্যে (এটি) প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহুম্মা আমিন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খন্ড-২০, পৃ: ৫০৭-৫০৮)

আর আজ পর্যন্ত যারাই এটি পাঠ করেছে, কোনো কোনো অআহমদী এমনকি খ্রিষ্টানরাও অনেক প্রশংসা করেছে।

আল্লামা নিয়ায ফতেহপুরী সাহেব, যিনি বিখ্যাত কলামিস্ট, গবেষক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। মাসিক নিগার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি তফসীরে কবীর অধ্যয়ন করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) -কে একটি পত্র লিখেন। তিনি আহমদী ছিলেন না। "তফসীরে কবীরের তৃতীয় খণ্ড বর্তমানে আমার সামনে রয়েছে। আমি গভীর মনোযোগ সহকারে এটি পড়ছি। এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন অধ্যয়নের একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আপনি সৃষ্টি করেছেন। আর এই তফসীর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একেবারে প্রথম তফসীর যাতে যুক্তি ও শাস্ত্রকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখানো

হয়েছে। আপনার জ্ঞানের গভীরতা, আপনার দৃষ্টির গভীরতা, আপনার অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও বিচক্ষণতা, আপনার দলীল প্রদানের সৌন্দর্য এর এক একটি শব্দ থেকে প্রতিভাত হয়। আর আমার আক্ষেপ হলো, আমি এতদিন এ সম্পর্কে কেন অনবহিত ছিলাম।" যিনি এসব কথা বলছেন তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এরপর বলেন, "গতকাল সূরা হুদের তফসীরে হযরত লুত (আ.) সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জেনে হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে এবং অবলিলায় এই পত্রলিখতে বাধ্য হয়েছি। আপনি 'হাউলায়ে বানাতি'র তফসীর করতে গিয়ে অন্যান্য তফসীরকারকের থেকে ভিন্ন বিতর্কের যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তার প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত।"

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১৯, পৃ : ১৫৭-১৫৮)

এরপর আরেকটি পত্রে লিখেন, "রাতে আমি নিয়মিত এটি পাঠ করি। আমার মতে এটি উর্দুতে একেবারে প্রথম তফসীর যা অনেকাংশে মানব মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করতে পারে।" এরপর বলেন, "এই তফসীরের মাধ্যমে ইসলামের যে সেবা (আপনি) করেছেন তা এতটাই সুউচ্চ যা আপনার বিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারে না। ওয়া যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতিহি মাইয়্যাশাউ।"

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পুস্তক পরিচিতি)

শেঠ মুহাম্মদ আযম সাহেব হায়দ্রাবাদী বর্ণনা করেন, ইনি আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি নবাব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ; যার সাথে শেঠ সাহেবের খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ সাহেব আহমদী ছিলেন না। তার সাথে শেঠ সম্পর্ক ছিল। শেঠ সাহেব বলেন, নবাব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ স্বীয় সাহচর্যে অধিকাংশ সময় তফসীরে সগীরের উল্লেখ করতেন এবং সর্বদা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করতেন। আর বলতেন, এতে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান থেকে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড , পৃ : ১৫৮)

অতঃপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ বিভাগের প্রধান জনাব আখতার রিনভী সাহেব এম, এ নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ২৪:৫০আমি পাটনা কলেজের ফার্সী বিভাগের সাবেক প্রধান এবং বর্তমানে পাটনার শাবীনাহ্ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ব্যয়দাল (বা বেদাল) সাহেবকে পর্যায়ক্রমে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রচিত তফসীর কবীরের কয়েকটি খণ্ড দিয়েছি। তিনি এসব তফসীর পাঠ করে এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি শামসুল হুদা আরবী মাদ্রাসার শিক্ষকগুলীকেও এই তফসীরের কয়েকটি খণ্ড পড়তে দেন এবং একদিন কয়েকজন শিক্ষককে ডেকে তিনি তাদের মতামত জানতে চান। একজন শিক্ষক উত্তরে বলেন, ফার্সী তফসীরগুলোর মধ্যে এমন তফসীর পাওয়া যায় না। অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সাহেব জিজ্ঞেস করেন, আরবী তফসীরগুলো সম্পর্কে কী মনে করেন? শিক্ষকমণ্ডলী (তখন) নীরব থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্য হতে একজন বলেন, পাটনাতে সকল আরবী তফসীর পাওয়া যায় না। মিশর এবং সিরিয়ার সমস্ত তফসীর পাঠ করার পরই সঠিক মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব। অধ্যাপক সাহেব প্রাচীন বিভিন্ন আরবী তফসীরের উল্লেখ করতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, " মির্যা মাহমুদের সম্মানের একটি তফসীরও কোনো ভাষায় পাওয়া যায় না। আপনারা মিশর এবং সিরিয়া থেকে আধুনিক তফসীরগুলোও আনিয়ে নিন এবং কয়েক মাস পরে আমার সাথে আলাপ করুন। (এতে সেখানে) উপবিষ্ট আরবী এবং ফার্সীর আলেমগণ হতবাক হয়ে যান। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড, পৃ : ১৫৮-১৫৯)

অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা এবং লক্ষ্ণৌ-এর সিদকে জাদীদ পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মৃত্যুতে লিখেন, "করাচি থেকে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, আহমদীয়া জামা'ত (এবং) কাদিয়ানীদের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ গত ৮ নভেম্বর রাবওয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন কুরআন ও কুরআনের জ্ঞানের বিশ্বময় প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য স্বীয় দীর্ঘ জীবনে পরিশ্রম এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন- তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুরস্কৃত করুন। আর তাঁর এসব সেবার কারণে তাঁর প্রতি সাধারণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। জ্ঞানের আলোকে কুরআনের সত্যতা এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত যে তফসীর এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর অনুবাদ তিনি করে গেছেন এরও এক সুমহান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।"

(সিদকে জাদীদ, লক্ষ্ণৌ, খন্ড-১৫. সংখ্যা-৫১, নভেম্বর, ১৯৬৫)

এরপর মৌলভী মাযহার আলী জাফর আলি নামে একজন প্রসিদ্ধ আহরারী নেতা ছিল। তিনি স্বরচিত পুস্তক 'এক খওফনাক সাজেশ' বা একটি ভয়ানক চক্রান্তে ' লিখেন, মৌলভি যাফর আলী সাহেব বলেন, আহমদীদের বিরোধীতার নেপথ্যে আহরারীরা অনেক অর্থ উপার্জন করেছে। আহরারীরা আহমদীদের বিরোধিতার নামে অর্থ উপার্জনের বড় একটি সুযোগ পেয়েছে (টাকা উপার্জনের জন্য)। তিনি বলেন, কাদিয়ানীদের বিরোধিতার নামে দরিদ্র মুসলমানদের রক্ত পানি করে উপার্জিত অর্থ গ্রাস করছে। আহরারীদের কেউ জিজ্ঞেস করুন, হে ভালো মানুষের দল! তোমরা মুসলমানদের কী এমন শুধরিয়েছ বা উপকার করেছ? তোমরা ইসলামের কী সেবা করেছ? ভুলেও কি (কখনো) তোমরা ইসলামের তবলীগ করেছ? তিনি স্বয়ং একজন আহরারী ছিলেন। তিনি বলছেন, "আহরারীরা কান খুলে শোনো! তোমরা এবং তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গরা কিয়ামত পর্যন্ত মির্যা মাহমুদের মোকাবিলা করতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে কুরআনের জ্ঞান আছে। তোমাদের কাছে এমন কী আছে? তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে, কুরআনের সাদামাটা অক্ষরও পড়তে পারে? তোমরা তো স্বপ্নেও কখনো কুরআন পড় নি। তোমরা তো নিজেরাই কিছু জানো না (তাহলে) লোকদের কি বলবে? মির্যা মাহমুদের বিরোধিতা তোমাদের ফিরিশ্তারাও করতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে এমন জামা'ত আছে যারা তাঁর এক ইশারায় তন-মনধন (অর্থাৎ সর্বস্ব) তাঁর পদতলে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তোমাদের কাছে আছে কেবল গালিগালাজ আর কটুক্তি। ধিক্কার তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি। এরপর লিখেছেন, মির্যা মাহমুদের কাছে মুবাল্লিগ আছে, বিভিন্ন জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ রয়েছে। বিশ্বের সকল দেশে তিনি পতাকা উড্ডীন করে রেখেছেন। উচিৎ কথা না বলে আমি থাকতে পারছি না। আমি একথা অবশ্যই বলব যে, তোমাদের যদি মির্যা মাহমুদের বিরোধিতা করতেই হয় তবে প্রথমে কুরআন শিখো। মুবাল্লিগ প্রস্তুত করো। আরবী মাদ্রাসা চালু করো। বিরোধিতা করতে চাইলে সর্বাগ্রে মুবাল্লিগ প্রস্তুত করো। ভিন দেশে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলাম প্রচার করো। মির্যায়ীদের গালিগালাজ করানো এটি কোন ধরনের ভদ্রতা। এটি কি ইসলামের প্রচার? বরং এটি তো ইসলামের দুর্নাম করার নামান্তর।"

(তারিখে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫১৩)

এরপর 'লাহোরের ইমরূয পত্রিকা' তাদের ১৯৬৬ সালের ৩০শে মে'র সংখ্যায় 'তফসীরে সগীর'সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছে যে, প্রজ্ঞাময় কুরআন সমগ্র মানবমণ্ডলির জন্য সত্য ও হিদায়াতের উৎস এবং ঝরণাধারা। আদি থেকে কিয়ামতকাল অবধি এই গ্রন্থ , সুস্পষ্ট গ্রন্থ মানুষকে ধর্মীয় এবং জাগতিক বিষয়াদিতে ন্যায়বিচারের পথ প্রদর্শন করতে থাকবে আর পথভ্রষ্টদের সরল-সুদৃঢ় পথে ফিরিয়ে আনতে থাকবে। (হায়! বর্তমান যুগের আলেমরাও যদি এটি উপলব্ধি করতো।) পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। লিখেছেন, পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের এমন কোনো দিক , এমন কোনো অধ্যায় কিংবা এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে আমরা কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে না পারি। তবে, এজন্য স্বভাবতই কুরআনের অর্থ সম্পর্কে বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে বিধৃত ঐশী নির্দেশাবলীর তত্ত্বসমূহ সুস্পষ্ট না হবে (ততক্ষণ) সত্য ও হিদায়াতের ধারা কীভাবে সূচিত হবে। (এটি অনুধাবন করাও আবশ্যক। তবেই জানতে পারবে যে কি লিখা হয়েছে।) এই প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিপটেই কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা ও তফসীরের ধারা আরম্ভ হয় আরপবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে এখন অবধি এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে। যারা কুরআনের মর্ম বুঝানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রেখেছে নিশ্চয় (তারা) কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। (তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত)। তফসীরকারকগণ নিজ নিজ যুগে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরতে যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন তারা এ দৃষ্টিকোন থেকেও প্রশংসার দাবি রাখবেন যে, এভাবে কুরআনের তফসীর রীতিমত একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে আর অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের একটি সুদৃঢ় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই ধারাবাহিকতা বজায় আছে এবং অব্যাহত থাকবে। এরপর তফসীরে সগীর সম্পর্কে আরো লিখেন যে, এখন তফসীরে সগীরের কথা বলছি। এই তফসীর আহমদীয়া জামা'তের প্রয়াত নেতা আলহাজ্ব মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল। কুরআনের আরবী টেকস্ট এর উর্দূ অনুবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যার জন্য টিকা ও বিস্তারিত নোট সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুবাদ এবং টিকার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য।"

(তারিখে আহমদীয়াত, খন্ড-১৯, প্: ৫৪১-৫৪২)

এরপর কন্দীল নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল যা ১৯৬৬ সালের ১৯শে জুনের সংখ্যায় লিখে, "আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোর এবং তাজ কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআন প্রকাশনারক্ষেত্রে যে সুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। পুনরায় তফসীরে সগীর সম্পর্কে বলেন, তফসীরে সগীর প্রকাশের মাধ্যমে এই মনোহর প্রচেষ্টায় বৃদ্ধি ঘটেছে। তফসীরে সগীরের অনুবাদ এবং ব্যাখা আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের (কঠোর) পরিশ্রমের ফসল। অনুবাদ এবং টিকার অনুবাদ সহজবোধ্য যাতে প্রত্যেক জ্ঞানগত সামর্থের অধিকারী মানুষ এথেকে উপকৃত হতে পারে। অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটিও ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে যে, পূর্বাপর সকল তফসীর দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। পুনরায় বলেন, পবিত্র কুরআনকে এমন সুন্দরভাবে মুদ্রণ করে প্রকাশ-প্রচার করাও অনেক বড় একটি ইসলামের সেবা।"

(আল ফযল, ২৩ শে জুন, ১৯৬৬, পৃ: ৫)

বর্তমানে পাকিস্তানের আলেমরা একথা বলে যে, এতে পরিমার্জন করা হয়েছে তাই (এটি) বাজেয়াপ্ত করা হয়। তফসীরে সগীর পাকিস্তানে বাজেয়াপ্ত। এটিকে কেউ নিজের বাড়িতেও রাখতে পারে না। অথচ এদের প্রবীণ ন্যায়পরায়ণ মানুষরা বলে যে, এর সমতুল্য কোনো তফসীর নেই, এটি প্রশংসার যোগ্য। আরএর মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে।

আল্লাহ তা'লা বর্তমান যুগের আলেমদেরও ন্যায়ের দৃষ্টিতে (এটি) দেখার তৌফিক দিন।

এরপর কুরআনের ইংরেজি তফসীরের ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য ইউরোপ ও আমেরিকার শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে। তারা এগুলোর অসাধারণ পর্যালোচনা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে।

প্রসিদ্ধ স্কলার এ.জে.আরবেরি সাহেব লেখেন: পবিত্র কুরআনের এই নতুন অনুবাদ ও তফসীর অনেক বড় এক কর্মযজ্ঞ। বর্তমান খণ্ড এই কর্মযজ্ঞের প্রথম ধাপ। (তিনি একটি খণ্ড পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে বলছেন) পনের বছর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, জামা'তে আহমদীয়া কাদিয়ানের বিজ্ঞ আলেমরা এই মহান কাজ শুরু করেছে আর এই কাজ হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের উৎসাহব্যাঞ্জক নেতৃত্বে হতে থেকেছে। এই কাজ অতি উন্নতমানের ছিল অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের মাতান (তথা টেক্সটের) এমন একটি সংস্করণ ছাপা যার পাশাপাশি এর সঠিক ইংরেজী অনুবাদ তাকা উচিত আর এর পাশাপাশি প্রত্যেক আয়াতেরও তফসীর থাকতে হবে। এরপর বলেন, শুরুতে এর এক দীর্ঘ ভুমিকা রয়েছে যা স্বয়ং হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন সাহেব লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর সেই ভুমিকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, এর মাঝে কী কী আছে। এরপর বলেন, আমরা যদি এই কাজকে ইসলামের জ্ঞনের স্বাদের গবেষণা বিদ্যার একটি সুমহান স্মৃতিচিহ্ন বলি তাহলে অত্যুক্তি হবে না। এর প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে নির্ভরযোগ্য বইপুস্তক, তফসীর ও ইতিহাস ইত্যাদি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এসব পুস্তকের দীর্ঘ তালিকা পাঠকদের প্রভা বিত করে। এটি থেকে বুঝা যায় যে, এই অনুবাদ এবং তফসীর প্রস্তুত করতে গিয়ে আলেমরা কেবল সকল প্রসিদ্ধ আরবী তফসীরই অধ্যয়ন করেন নি বরং এরপাশাপাশি ইউরোপিয়ান ধর্মযাজকরা সমালোচনা করতে গিয়ে যা লিখেছে তা-ও সম্মুখে রেখেছেন। যদি কেবল অনুবাদের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে বলতে হয় যে, অনুবাদের ইংরেজী ভুলত্রুটিমুক্ত আর খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, অমুসলিম আপত্তিকারকদের আপত্তির খণ্ডনও এতে রয়েছে। আর অন্যান্য ধর্মের যথার্থ সমালোচনাও আছে। অমুসলিম পাঠকদের কাছে কোনো কোনো অংশ আপত্তিকর ও একপেশে বলে মনে হবে কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, সেই অংশগুলোও আ ন্তরিকতার সাথে লেখা হয়েছে আর গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ার যোগ্য। এটি থেকে বুঝা যায় মুত্তাকী এবং জ্ঞানী মুসলমান যখন অন্য ধর্মের ঐতিহ্যগত শিক্ষার ওপর আপত্তি করে- তা কেন করে। " (তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ : ৬৭২-৬৭৩)

এরপর ডাক্তার চার্লস এসব্রিডেন যিনি আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টির্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ধর্মীয় সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, তিনি লিখেছেন: এই বইয়ের ছাপা খুবই উন্নতমানের আর টাইপও খুবদ উন্নত যা খুব সহজে পাঠ করা যায়। মোটের ওপর ইংরেজী ভাষার ইসলামী সাহিত্যে এটি একটি প্রসংশনীয় সংযোজন। এই কারণে সমস্ত পৃথিবী জামা'তে আহমদীর প্রত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ : ৬৭৪)

প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান পত্রিকা আল-নাসর লেখে, "জামা'তে আহমদীয়া আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে আর এই কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে মোবাল্লেগ প্রেরণের মাধ্যমে হয়ে চলেছে আর বিভিন্ন বইপুস্তক এই প্রজ্ঞাপনের প্রচারের মাধ্যমেও যার মাধ্যমে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতা উপস্থাপন করা হয়। আমরা পবিত্র কুরআনের উংরেজী অনুবাদ দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এই অনুবাদ জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। কুরআনের অনুবাদ নান্দনীয় এবং পাঠকের জন্য সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। এই অনুবাদ উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির ধারকবাহক। এক কলামের কুরআনের আয়াত দেয়া হয়েছে এবং অপর করামে পাশাপাশি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর বিস্তারিত তফসীরও উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন পাঠক এই তফসীরে পাশ্চাত্যের ধর্মজাযক এবং ইউরোপিয়ান বিদ্বেষীদের আপত্তির বিস্তারিত জবাবও খুঁজে পায়। এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব এই অনুবাদের পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীও লিখেছেন আর সেই জীবনী ও অনুবাদ সত্যিই অনন্য।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ : ৬৭৫-৬৭৬)

যাইহোক তফসীরে কবীর, তফসীরে সগীর এবং ফাইভ ভলিউম কমেন্ট্রি সম্পর্কে এগুলো হলো বিভিন্ন মন্তব্য। এখন আমি কিছু বক্তৃতার বিষয়েও উল্লেখ করছি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর জ্ঞানভাণ্ডার যা তিনি বক্তৃতা ইত্যাদির আকারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর প্রশংসা অন্যরাও করেছেন এবং সেগুলোকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন সে সম্পর্কে বলছি। তাঁর একটি বক্তৃতা ছিল নেযামে নও (তথা নতুন বিশ্বব্যবস্থা)। এটি তিনি অন্যদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এটির ওপর পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করতে গিয়ে মিশরের বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং শিক্ষক আব্বাস মাহমুদ উল আ'কাব , এই জগদ্‌বিখ্যাত বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পর মিশরের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'আর রিসালা'-তে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এই বক্তৃতা পাঠে এবিষয়টি স্পষ্ট যে, বিজ্ঞ বক্তা হলেন মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ এবং তিনি বিশ্বব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলেন, অভাবি ও দরিদ্রদের সমস্যা নিরসন করা হোক অথবা সরাসারি বলতে গেলে অন্যদের জমা করা অর্থ সারাবিশ্বের জাতিসমূহ ও মানুষের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা উচিত। নিঃসন্দেহে তিনি অর্থাৎ বক্তা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ গোটা বিশ্বকে নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে অর্থাৎ এই সমস্যা ও কঠিন কাজটি সমাধা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ফাশইজম, নাযিইজম, কমিউনিজম এবং অন্যান্য যে-সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা চলমান আছে সেসকল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি সকল দিক থেকে অবগত এবং জ্ঞাত। এমনিতেই লিখে দেন নি। এই সমস্ত নতুন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তার জ্ঞানও ছিল এবং অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ছিল। একইসাথে তিনি বলেন, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি এ বিশ্বাসও পোষণ করেন আর যা একেবারে সঠিক তা হলো, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দলীয় নেতারা এবং সরকার এই কঠিন কাজটি সমাধান করতে পারবে না, তাই এহেন কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, কেননা প্রতিটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল কঠিন বিষয়ের সমাধান ও নিরসন কেবল সমস্ত মানুষ মিলেই করতে পারে। একারণে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যা প্রশান্তিদায়ক এবং পুণ্যকর্ম ও সংশোধনের জন্য সাহস যোগায় তা হলো, বিশ্বাস ও ঈমান। এটিকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। এরপর তিনি ভারতের বড় বড় ধর্মের প্রতি বিশেষত এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টি দিয়েছেন যেন তা থেকে সেই চিকিৎসা উদ্ঘাটন করা যায় যা পৃথিবীর সমস্যা দূর করতে পারে [অথাৎ তিনি এর সমাধান উপস্থাপন করেছেন।] যেন পৃথিবীর এসব ধর্ম থেকে সেসব নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করা যায় যা বর্তমান সমস্যা দূরীভূত করতে পারে কেননা এসব কষ্ট দূর করার দায়িত্ব অন্যান্য ধর্মের রয়েছে।"

অতঃপর তিনি লিখেন, এরপর তিনি অনেক দলিলপ্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করেছেন যে, প্রথমে তো ঠিক আছে তারা নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী নতুন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করুক যদি থাকে তবে কিন্তু তা করতে পারবে না। অতঃপর লিখেন, তিনি অনেক দলিলপ্রমাণ উপস্থাপন করে এটি বুঝিয়েছেন যে, এই সকল ধর্মের মধ্যে কেবল ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নিজের মাঝে এই সমস্যাদি দূর করার শক্তি রাখে আর সকল জাতি এবং সকল মানুষ এর ওপর আগেও আমল করতে পারত এবং বর্তমানেও আমল করতে পারে।"

অতঃপর (মাহমুদ আলকাদ সাহেব নেযামে নও-এর সেই অংশের সারাংশ নিজের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।) বলেন, "অন্যান্য বিজ্ঞ বক্তারা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের মোকাবিলা ও তুলনা করতে কোনো কমতি রাখে নি যা আমি উপরুল্লিখিত লেখায় সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করেছি। তিনি লম্বাচওড়া বিবরণ দিয়েছেন যা আমি পড়ি নি। যাহোক, তিনি বলেন, বরং তিনি বিশেষত সেটির উপর গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছেন কেননা কেবল বিশ্বাগত দিকই- যেমন তিনি বলেছেন, এমন একটি বিষয় রয়েছে যার ফলে সমাধানের আশা করা যায়। এ সবের সাথে তিনি সেসব বিশ্বাসসমূহের তত্ত্বনিরূপণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা ছাড়াও এসব রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনার পুঙ্খানূপুঙ্খভাবে তত্ত্বনিরূপণ করে প্রমাণ করেছেন যে বাস্তবিক ক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, এগুলো নিজ উদ্দেশ্যে অসফল রয়েছে। এরপর "নিযামে নও" (পুস্তকের) সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আরো বলেন, এ কথাগুলো যদি আমেরিকার ইংরেজী ভাষাভাষীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় বরং ভারতবাসী ও প্রাচ্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তা অবশ্যই তাদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করবে।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ : ৩৬৯-৩৭০)

এর পর তার পুস্তক "ইসলাম মে ইখতালাফাত কা আগায"।

এটি তার একটি বক্তৃতা যা তিনি ইসলামিয়া কলেজ লাহোরে, মর্ডান হিস্টোরিকাল সোসাইটির একটি অধিবেশনে করেছিলেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের উপর পূর্ণাঙ্গীন দক্ষ হবার প্রমাণপূর্বক এমন বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা করলেন যে, বড় বড় ইতিহাসবীদরা নিজেদেরকে তার সামনে শিশু মনে করতে লাগলো/ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র মনে করতে লাগলো। আমি এখানে এর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে দিচ্ছি, "এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উসমান (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবা প্রত্যেক ফিতনা এবং ত্রুটি হতে মুক্ত ছিলেন। বরং তারা উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। পূণ্যের উচ্চ মার্গে তাদের বিচরণ ছিল। আমরা কাউকেও দোষী বলতে পারি না। না তো হযরত উসমান (রা.) কে আর না-ই সাহাবীদের । তিনি (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের উপর সাহাবীদের কোন আপত্তি ছিল না। হযরত আলী শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছেন। তিনি এ আরোপও ভূল প্রমাণ করেছেন যে সাহাবীগণ বিদ্রোহ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.), হযরতা তালহা (রা.) এবং হযরত যুবেয়র (রা.) এর বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগও সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা। এ পুস্তকে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। আনসারদের বিরূদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তারা হযরত উসমান (রা.) প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এটিও ভূল। কেননা আমরা দেখি আনসারদের সব সর্দারগণ এ ফিতনা নির্মূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ পুস্তক সম্পর্কে অন্যদের যে অভিমত রয়েছে তা নিম্নরূপ।

সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব, এম.এ. ইসলামিয়া কলেজ লাহোরের প্রফেসর, লিখেন, জ্ঞানী পিতার জ্ঞানী সন্তান হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ এর নাম-ই এ বিষয়ের প্রত্যয়ন করে যে তার বক্তৃতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও বাগ্মিতাপূর্ণ হবে। আমার সম্পর্কে বলা হয় আমিও মানব ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখি। আমি দাবী করে বলতে পারি, মুসলমান অথবা অমুসলিম ইতিহাসবীদদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন যারা হযরত উসমান (রা.) এর যুগের মতবিরোধের মূলকারণ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এবং এ ভয়ংকর ও প্রথম গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্জা সাহেব কেবল গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ বুঝতে সক্ষম হন নাই বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে সেসব কারণ ও ঘটনাসমুহ বর্ণনা করেছেন যার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খেলাফতের প্রাসাদ নড়বড়ে ছিল।

আমি মনে করি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের আকর্ষণ রয়েছে তাদের দৃষ্টিতে এর পূর্বে এমন তথ্য কখনও আসে নাই। প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা.) এর যুগের আসল ইতিহাস যত বেশী অধ্যায়ন করা হবে এ প্রবন্ধটি তত বেশী শিক্ষনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে হবে।" (ইসলাম মে ইখতালাফাত কা আগায, ভূমিকা পৃষ্ঠা)

আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত তাই তা বর্ণনা করা যাচ্ছে না। এর পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরেকটি বক্তৃতা হলো "ইসলাম কে ইকতেসাদী নিযাম"। এটি একটি বক্তৃতা যা আহমদীয়া হোস্টেলে হয়েছিল। এর ব্যপ্তি ছিল প্রায় আড়াই ঘন্টা। এ সময়ে আহমদী ছাড়া শত শত বরং কয়েকজন লিখেছেন যে, হাজার হাজার মুসলমান ও অমুসলমান সূধী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুসলমান ও অমুসলমান উপস্থিতি যাদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত ছিল এবং পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্র ছিল। বক্তৃতার সময় অধ্যাপকেরা, উকিলরা এবং অন্যান্য শিক্ষিত বুদ্ধরাও অনেক নোটস নিতে থাকেন।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পুস্তক পরিচিতি, 'ইসলাম কা ইকতেসাদি নিযাম, পুস্তক পরিচিতি)

ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সারকথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলামী অর্থনীতি হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের একটি যথাযথ সমন্ব য়ের নাম। [স্বাধীনতাও থাকে আবার প্রশাসনের দখল থাকে কিন্তু এরা পরস্পরের মাঝে সংগতিপূর্ণ মিল রাখে, সমন্বয় করে। অর্থাৎ বিশ্ববাসীর সামনে ইসলাম যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করে তাতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সরকারের দখলও রাখা হয়েছে এবং একটি সীমা পর্যন্ত ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এদুটির যথাযথ সমন্বয়ের নাম হলো ইসলামী অর্থনীতি। ব্যক্তিস্বাধীনতা রাখার কারণ হলো ব্যক্তি যাতে নিজের জন্য পারলৌকিক পুঁজি/ মূলধন জমা করে নেয় এবং তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেতনা উন্নতি করে। শুধু জাগতিক প্রতিযোগিতা নয় বরং পরকালের জন্যও পুণ্যকর্ম সাধনের মাধ্যমে অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতাও চালু থাকে। তিনি (রা.) আরো বলেন, এছাড়া সরকারের দখলদারী রাখার কারণ হলো ধনীরা যেন তাদের দরিদ্র ভাইদেরকে আর্থিকভাবে ধ্বংস করার সুযোগ না পায়। অতএব সাধারণ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার যতটা প্রশ্ন রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ আবশ্যক মনে করা হয়েছে আর সু স্থ প্রতিযোগিতা ও পারলৌকি জীবনের জন্য পাথেয় জমা করার যতটা বিষয় রয়েছে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পদদলীত করার পরিবর্তে এর পরিপূর্ণ সুরক্ষা করা হয়েছে। অতএব ইসলামী অর্থ নীতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতারও পূর্ণ সুরক্ষা করা হয়েছে যাতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বে চ্ছাসেবার মাধ্যমে পারলৌকিক জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে আর সুস্থ প্রতিযোগিতার চেতনা উন্নতি করে মানসিক উন্নতির ময়দানকে সর্বদার জন্য বিস্তৃত করতে থাকে এবং প্রশসানের দখলও প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে যাতে ব্যক্তির দুর্বলতার কারণে অর্থনীতির ভিত্তি অন্যায়, অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় আর সাধারণ মানুষের কোনো অংশের পথেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পুস্তক পরিচিতি, 'ইসলাম কা ইকতেসাদি নিযাম, পৃষ্ঠা: ৩৫)

"হুযূর (রা.) তাঁর বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন আর শেষমেষ এ-সংক্রান্ত বাইবেলের একটি সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীর উর্দু উদ্ধৃতি শোনানো ছাড়াও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং নিজের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীরও উল্লেখ করেন। মোটকথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বক্তৃতাটি শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি স্তরেই এর অসাধারণ সফলতা অর্জিত হয়।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পুস্তক পরিচিতি, 'ইসলাম কা ইকতেসাদি নিযাম, পৃষ্ঠা: ৩)

" উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী গভীর আগ্রহ নিয়ে এই বক্তৃতাটি শ্রবণ করে আর মানুষ এতো দীর্ঘ সময় ধরে এমনভাবে বসে থাকে যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। একাধারে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত বক্তৃতা চলেছিল। এই বক্তৃতা শুনে একজন অধ্যাপক কেঁদেই ফেলেন এবং কিছু সংখ্যক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্র এই মনোভাব ব্যক্ত করেন যে, তারা ইসলামী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে গেছে আর এখন তারা একে নির্ভুল ও সঠিক মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এমএ ক্লাসের কিছু সংখ্যক ছাত্র হুযূর (রা.)-এর এই বক্তৃতা সম্পর্কে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তা হলো এর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকদের কাছে প্রেরণ করা উচিত। সেই যুগে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল আর অধিকাংশ অধ্যাপক ইংরেজ ছিল। একই সাথে তারা আরো বলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে যেখানে বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হচ্ছে সেখানে এই ইসলামী ব্যবস্থাপনাও মুসলমানদের চিন্তাভাবনার প্রতিনিধিত্ব করবে যা হুযূর (রা.) উপস্থাপন করেছেন।"

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পুস্তক পরিচিতি, 'ইসলাম কা ইকতেসাদি নিযাম, পৃষ্ঠা: ২-৩)

লাহোর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী লালা রাম চন্দ্র মাচান্দা সাহেব এ বক্তৃতার সভাপতিত্ব করেন। যিনি প্রতিবেদন লিখেছেন তিনি বলেন, অসাধারণ বক্তৃতার পর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী লালা রামচন্দ্র মাচান্দা সাহেব একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি, কেননা আমি এরূপ মূল্যবান বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেয়েছি। এছাড়া আমি একারণে আনন্দিত যে, আহমদীয়া আন্দোলন উন্নতি করছে এবং অসাধারণ উন্নতি করছে। আপনারা সবাই এখন যে বক্তৃতা শুনলেন তাতে অত্যন্ত মূল্যবান ও নতুন নতুন বিষয়াদি আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত ইমাম বর্ণনা করেছেন। আমি এই বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি এবং আমি মনে করি, আপনারাও হয়তো এসব অমূল্য তথ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আমি একারণেও আনন্দিত যে, এই অনুষ্ঠানে শুধু মুসলামানরা নন বরং অমুসলিমরাও উপস্থিত আছেন।"

তিনি আরো বলেন, " আগে আমি মনে করতাম এবং আমার এই ধারণাটি ভুল ছিল যে, ইসলামের বিধিবিধানে শুধুমাত্র মুসলমানদের কথাই দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে আর অমুসলিমদের কথা মোটেও দৃষ্টিপটে রাখা হয় নি। কিন্তু আজ আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত ইমামের বক্তৃতা থেকে বুঝতে পেরেছি, ইসলাম সমগ্র মানবমণ্ডলীর মাঝে সাম্যের শিক্ষা দেয় আর এটি শুনে আমি খুবই প্রীত হয়েছি। আমি অমুসলিম বন্ধুদের বলব, এমন ইসলামকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে আপনাদের আপত্তি কোথায়? আপনারা যেমন গাম্ভীর্যের সাথে, শান্তভাবে বসে আড়াই ঘণ্টা যাবৎ আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত ইমামের বক্তৃতা শুনেছেন তা দেখলে যেকোনো ইউরোপীয় আশ্চর্য হতো যে, ভারতের মানুষের এতটা উন্নতি হয়েছে!"

প্রতিবেদক আরো লিখেন, "বক্তৃতা শোনার পর অধিকাংশের মুখেই প্রশংসাবাণী শোনা যাচ্ছিল, বরং বৃহৎ একটি অংশ একথা স্বীকার করে যে, ধর্মীয় মতাদর্শের দিক থেকে যদিও আমরা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সাথে মতানৈক্য পোষণ করি [আমাদের আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন, তিনি যে আকীদা রাখেন আমরা তা মানি না।] কিন্তু এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না! [আকীদাগত ভিন্নতা থাকাসত্ত্বেও তারা এটি স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং বলছেন যে,] এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, তিনি বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম [আর বাস্তবতাও তা-ই ছিল।] অর্থনীতি সম্পর্কে কুরআনের তত্ত্ব ও প্রজ্ঞার এরূপ উদ্ঘাটন এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক দর্শনের এরূপ খণ্ডন আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষ থেকে এভাবে উপস্থাপন করা হয় নি, যে ব্যবস্থাপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং ইসলামের অস্বীকারকারীরাও স্বীকার করেছে এবংস্বয়ং সমাজতন্ত্রের সমর্থকরা সমাজতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বস্তত মৌলভী শের আলী সাহেব বর্ণনা করেন, তিনি বক্তৃতার পর কয়েকজন অ-আহমদী যুবককে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে শুনেছেন যে, এরপরও যদি তোমরা কমিউনিস্টদের বা সমাজতন্ত্রের সমর্থন করো তবে তোমাদের জন্য অভিসম্পাত!" অনুরূপভাবে জনৈক অধ্যাপক, যার উল্লেখ ইতিপূর্বেও এসেছে, তিনি এই বক্তৃতা শুনে (আবেগে) কেঁদে ফেলেন।

বক্তৃতা শেষ হলে অ-আহমদী অধ্যাপক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয় তা হলো, সময়ের স্বল্পতার জন্য যেহেতু হুযূর (রা.) তাঁর বক্তৃতায় বিষয়বস্তুর সবগুলো দিকের ওপর নিজের মতামত তুলে ধরতে পারেন নি, তাই আরো একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হোক যেখানে বিষয়টির অবশিষ্ট অংশগুলোও সুস্পষ্ট করা হবে যেন মানুষ জ্ঞানের সেই ঝরনাধারা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে যা আল্লাহ্ তা'লা হুযূর (রা.)কে দান করেছেন।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৫-৪৯৭)

(এভাবে) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পূর্ণ করা হয়েছে।

লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব এম.এ, যিনি ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন, তিনি লাহোর সানরাইজ পত্রিকায় 'ইসলাম ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক একটি নোট লিখেন যার অংশবিশেষ হলো- তিনি লিখেন, "ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। যে বক্তৃতাটি শোনার সৌভাগ্য আমার লাভ হয়েছে সেটিও তাঁর অন্যান্য বক্তৃতার ন্যায় জ্ঞানের ভুবনে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এবং তথ্যবহুল ছিল। মির্যা সাহেব খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী। মির্যা সাহেব খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী এবং এ বিষয়ে সার্বিকভাবে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।" কোনো ডিগ্রীধারী নন, কোনো গবেষণাও করেন নি, কিন্তু আল্লাহ তা'লা শিখিয়েছেন। " এজন্যে তাঁর চিন্তাধারা এ বিষয়ের দাবি রাখেযে, আমরা এগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এগুলোর প্রতি মনোযোগী হই।" (তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৯)

বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে। এর অনুবাদ পড়ে ভিনদেশী প্রেস এবং শিক্ষিত সমাজও অনেক প্রশংসা করেছে। যেমন- স্পেনের সুপ্রিম ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট এস ওয়াই ডি জোস কাস্টন এটি পড়ে মৌলভী করম আলী জাফর সাহেবকে লিখেন, আমি আপনার পত্রের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আর এর সাথে একটি চমৎকার পুস্তকও ছিল যা অধ্যয়ন করে আমার প্রকৃতিতে অত্যন্ত উন্নত এবং গভীর প্রভাব পড়েছে। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, আল্লাহ তা'লা আপনাকে এই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 20 July, 2023 Issue No.29

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

স্পেনে এবং এর বাইরে বিরাট সফলতা দান করবেন। পুস্তকটি বর্তমান যুগের নিরিখে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।" (তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৫)

পুনরায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর মৃত্যুতে রোশনি শ্রীনগর পত্রিকা ১১নভেম্বর ১৯৬৫ সালের সংখ্যায় লিখেছে, অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির প্রথম সভাপতি জনাব মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বলেন, তিনি একজন উন্নত পর্যায়ের আলেম এবং চিন্তাবিদ ছিলেন। বক্তৃতা প্রদানে তার সমকক্ষ খুজে পাওয়া ভার। এমনকি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাএবং ইসলামের নব ব্যবস্থাপনার ন্যায় সুক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে এক এক বৈঠকে যে বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তার জ্ঞাঁ নী ও প্রজ্ঞাবান হওয়ার ধারণা এ বিষয়টি থেকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করা যায় যে, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস এর জর্জ জাস্টিস স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেবও তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তার ভাষায়, তার সত্তা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর এমন এক আকর্ষণীয় চিত্র উপস্থাপন করে যা একক ব্যক্তির সত্তায় বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত দুর্লভ। তিনি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন জ্ঞানের উৎসও ছিলেন। এখন অন্যান্যরাও এ কথা স্বীকার করছে যে, তিনি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের উৎস ছিলেন। তিনি সুচিন্তিত মতামত এবং কর্মক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। তার জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্বরণ ও চিন্তাভাবনায় কেটে যেত, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি অবিচল এবং নির্ভীক নেতা ছিলেন। তিনি আরো বলেন, জনাব মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব সম্পর্কে প্রত্যেক কাশ্মীরের হৃদয় পঞ্চমুখ। কেননা কাশ্মীরের স্বাধীনতার আন্দোলনে তার অনেক বড় অবদান আছে। ১৯৩১সালে যখন কাশ্মীর আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনিই অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং এটি তারই প্রচেষ্টার ফল ছিল যে, এ আন্দোলন বেগবান হয় এবং এর খ্যাতি/প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। "

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৮৪-১৮৫)

এছাড়া ওয়েম্বলে কনফারেন্স জামা'তের ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত। এতে তার যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে তাতে অন্যদের প্রভাব কেমন ছিল? প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ার পর সভাপতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমার অধিক বলার প্রয়োজন নেই। প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষতার প্রমাণ এটি নিজেই। তিনি ইংরেজ ছিলেন। বলেন, আমি কেবল নিজের পক্ষ থেকে এবং সভার উপস্থিত লোকদের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ বিন্যাসের সৌন্দর্য্য, চিন্তাধারার সৌন্দর্য্য এবং উন্নত মানের দলিল উপস্থাপনের রীতি দেখে খলিফাতুল মসীহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দর্শকদের চেহারার ভাষা আমার এ মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, তারা স্বীকৃ তি প্রদান করছে যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অধিকার রাখি এবং তাদের অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করছি। অতঃপর হযরত সাহেবকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করে যে, বক্তৃতার সফলতার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আপনার যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে তা ছিল অতিব উত্তম।"

রিপোর্ট প্রদানকারী লিখেছেন, "এক ব্যক্তি হযরত (খলিফা সানী রা.) কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি ভারতে ত্রিশ বছর দায়িত্ব পালন করেছি এবং মুসলমাদের অবস্থা ও দলীল-প্রমাণ অধ্যয়ন করেছি। কেননা, আমি ভারতে একজন মিশনারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু যে বিশেষত্ব, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে আজ আপনি আপনার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ইতিপূর্বে আমি তা কোথাও শুনিনি। এই প্রবন্ধ শুনে আমার ওপর- বিষয়বস্তুর দিক থেকে, বিন্যাসের দিকে থেকে এবং দলীল-প্রমাণের দিক থেকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।"

(আল ফযল, ২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৪, খণ্ড-১২, সংখ্যা-৪৫, পৃ: ৪)

যাইহোক, (এই প্রবন্ধ সম্পর্কে) অগণিত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে (রচিত) প্রবন্ধ ও বক্তব্য সমুহের সংখ্যা-ও অগণিত, যেভাবে আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি। আমি কেবলম গুটিকতক উদাহারণ উপস্থাপন করেছি মাত্র। ফাতাল আরব পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। ১৯২৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ইউরোপ সফরে গমন করেন তখন যাত্রা পথে আরব দেশ সমূহে-ও অবস্থান করেন আর সেই সময় আরব দেশ সমূহের সংবাদ মাধ্যম-ও তাঁর (সফর) সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। অতএব, দামেস্কের ফাতাল আরব পত্রিকা তাদের ১০ আগস্ট ১০২৪ সংখ্যায় লিখেছে , "এই খলীফা সাহেবের তার জীবনের চল্লিশ বছর পার করছেন। মুখমন্ডলে কালো শ্মশ্রু শোভা পায়। চেহারা গুদুম বর্ণের এবং প্রতাপ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ চেহারায় প্রকাশ পায়। চোখ দুটো পবিত্রতা, বিচক্ষণতা ও অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা বলছে। আপনারা তাঁর সামনে, যেখানে তিনি তাঁর বরফসম শুভ্র পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দাড়ান (তবে তাঁর) মানসিক দক্ষতা দেখলে আপনারা (পাঠকদেরকে বলছেন) বুঝতে পারবেন যে আপনি এমন একজন ব্যক্তিত্বের সামনে দাড়িয়েছেন তাঁকে বোঝার/ চেনার আগেই যিনি আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝে যাবেন। তিনি আপনাকে তাঁর চোখ দিয়ে দেখবেন আর তাঁর ঠোঁটে হাসি খেলা করে। পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, তাঁর ঠোঁটে হাসি খেলা করতে থাকে যা কখনো প্রকাশ্যে ও কখনো গোপনে রয়ে যায়, (তিনি) সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন- আপনি যদি সেই অবস্থা দেখেন তবে আপনি সেই হাসিতে লুক্কায়িত যে অর্থ রয়েছে এবং প্রতাপরয়েছে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।"

(মাসিক খালিদ পত্রিকা, সৈয়্যদানা মুসলেহ মওউদ সংখ্যা, জুন-জুলাই, ২০০৮)

অন্যদের এমন অসংখ্য প্রতিক্রিয়া রয়েছে সে সকল লোকদের যারা অল্পবিস্তর তাঁর (রা.)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছে। আলোচনার তথ্য-উপাত্ত তো অনেক ছিল, যেভাবে আমি বলেছি, আমি (আরো অনেক) সংকলন করিয়েছিলাম কিন্তু সময় সল্পতার কারণে আমি অল্পই উপস্থাপন করেছি তাও আবার সংক্ষিতরূপে উপস্থান করেছি তাও আবার সকল বিষয় লিখিনি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বিষয়গুলো ভবিষ্যতবাণীতে উল্লেখ করেছিলেন অথবা বলা উচিত যে, আল্লাহ তালা তিনি (আ.)-কে (যা) বলেছেন তা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্ত্বায় পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ তালা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলেন, কোন বড় আলেম-ও তার মোকাবেলা করতে পারত না। তাঁর (রা.) প্রদত্ত বক্তব্য জামাতের একটি ধনভান্ডার। তাঁর (রা.)-এর বক্তব্য সমূহ, (জুমার) খুতবা সমূহ, প্রবন্ধ সমূহ অধিকাংশই ছেপেছে কিছু ছাপা হচ্ছে। সেগুলো আমাদের পাঠ করা উচিত আর বর্তমানে অনুবাদের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, ইনশাল্লাহ! তাড়াতাড়িই সেগুলো সহাজ লভ্য হবে। ইংরেজী (অনুবাদের) তো অনেক কাজ শেষ হয়েছে (এবং) হচ্ছে, আমার (বলার) উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ছোট ছোট পুস্তকাদী (ইংরেজীতে) প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার (ভান্ডার) থেকে উপকৃত হওয়া তৌফিক দান করুন।

****

(২পাতার পর....)

ওঠাবসা করছে? যদি তাই হয় তবে আপনার তাকে বলা উচিত, যে-পথে তুমি যাচ্ছ সেটি সঠিক পথ নয়। এই পথ তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে এবং অবশেষে তুমি নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলবে। তার প্রতি সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করুন যাতে সে বুঝতে পারে যে আপনি তার সত্যিকার বন্ধু, তার সমব্যথী। এতে করে সে আপনার কথা শুনবে। কেননা অন্যান্য অনেক কারণও হতে পারে। অনেক সময় উঠতি বয়সের ছেলেদের বাড়িতে যখন অশান্তি হয়, মা-বাবার সম্পর্কের অবনতি হয়, তখন তারাও এর কারণ হয়। কেননা, মা-বাবা একদিকে একথা বলে যে, ধর্ম সৎকর্ম করার আদেশ দেয়, অপরদিকে তাদের নিজেদের আমলের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তারা নিজে এমনটি মোটেই করছে না। এই বিষয়টা ছেলেদেরকে বিচলিত করার জন্য যথেষ্ট। অনেক সময় জামাতের কিছু পদাধিকারী এই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ান। বুঝতে পেরেছেন? তাই অনেক কারণ হতে পারে, আপনাকে এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে আর সেই হিসেবে তাদের প্রতি আচরণ করতে হবে। মূল কথা হল আপনাকে তাদের মনে একথা গেঁথে দিতে হবে যে আপনি তার সমব্যথী এবং সব থেকে ভাল বন্ধু। এর ফলে সে আপনার কথা শুনবে।

একজন ওয়াকফে নও নিবেদন করে যে, সে একজন শহীদের সন্তান। পাকিস্তান থেকে আগত শহীদ পরিবারদের জন্য আপনার কি দিকনির্দেশনা রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার পিতাকে পাকিস্তানে শহীদ করা হয়েছিল। তিনি জামাতের জন্য নিজের জীবনের বলিদান দিয়েছিলেন। আর আপনি এদেশে আছেন জামাতের কারণে। এখানে এদেশে সামাজিক কলুষতায় লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সমাজের ভাল দিকগুলি অন্বেষণ করুন এবং এখানকার মানুষদের জন্য নিজেদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করুন। আপনি যদি ছাত্র হন, তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। যদি কাজ করে থাকেন তবে পরিশ্রমের সাথে কাজ করুন। আর সব সময় একথা মাথায় রাখবেন যে, আপনি যা কিছু করছেন তা আল্লাহ্ তা'লা সর্বক্ষণ দেখছেন এবং তিনি আপনার তত্ত্বাবধান করছেন। মানুষ না দেখলেও আল্লাহ্ তা'লা দেখছেন। আপনি যেহেতু জামাতের কারণে এখানে এসেছেন, যেহেতু আপনার পিতা বা কোন আত্মীয় জামাতের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাই আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর প্রতি মনোযোগী হওয়ার, সেুগুলো মেনে চলার, নিজেকে আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত এবং একজন আহমদী মোমেন হিসেবে তুলে ধরার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir